সহরবাসের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২



প্রথম সংস্করণ— ফাল্গুন, ১৩৫২
দ্বিতীয় মুদ্রণ—আষাঢ়, ১৩৬০
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬।
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

লেখকের কথা

কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ঘষামাজা করার প্রয়োজনও ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় ঘটনাচক্রে ওসব কিছুই করা হয় নি।

সংশোধন করা উচিত ছিল এরকম খুঁত ও অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকারা বইটিকে যে সমাদর করেছেন এজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমি দাবী করছি বইটিতে এবার কোন খুঁত রইল না!

প্রথম সংস্করণে সব চেয়ে বড় অসম্পূর্ণতা ছিল শ্রীপতি আর সন্ধ্যার—একটা পরিণতির দিকে এগোতে এগোতে দুটি চরিত্রেরই যেন খেই হারিয়ে গিয়েছিল। এই সোজা কথাটা সব লেখকই জানেন যে কোন চরিত্রের বিকাশ বা কাহিনীর গতি এমন যায়গায় থামানো চলে না যাতে প্রশ্ন জাগে: তারপর কি হল? গতিটা কোন পরিণতির দিকে এটুকু অন্তত ধরিয়ে দিতেই হবে—যাতে ধারাটা কল্পনা করে অনুভব করে নেওয়া সম্ভব হয়।

যেমন পীতাম্বর। মোহনের বাড়ী ছেড়ে পীতাম্বর কোথায় গেল কি করল বলার কোন প্রয়োজনই হয় না—অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে কোথাও কম খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে সে তার নতুন পেশা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকবে।

কিন্তু শ্রীপতির কথা যেখানে থেমেছে ওখানে তাকে থামানো যায় না, কদমের সংসারটুকুর জন্য গভীর টান এবং গ্রাম্য সংস্কার ও বিশ্বাস ভরা শ্রীপতিকে মোহনের সঙ্গে সহরে টেনে এনে কারখানায় কাজে ঢোকানোর কোন সার্থকতাই থাকে না।

কিভাবে তার চেতনা সর্বহারার চেতনায় রূপান্তরিত হল তার একটু সূত্র পাওয়া পর্যন্ত তার কথা বলতেই হবে।

এই সব খুঁত ও অসম্পূর্ণতার জন্য মনে খুঁত খুঁতানি ছিল—বর্তমান সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধনের সুযোগ পেয়ে খুসী হয়েছি।

আমি ভূমিকা লেখার জন্যই একটা ভূমিকা জুড়ে দেওয়ার নীতির বিরোধী। দু'চারটি বইয়ে দু'চার লাইন ভূমিকা হয় তো দিয়েছি। 'সহরবাসের ইতিকথা'র কপালেই আমার সব চেয়ে বড় ভূমিকা জুটল।

সংশোধন করতে গিয়ে বইয়ের আকার বেশ খানিকটা বেড়েছে। প্রকাশিত উপন্যাসের নূতন সংস্করণে বেশী রকম পরিবর্তন করা হলে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া লেখকের কর্তব্য বলে মনে করি।

এক

সহর পথে। আসল সহর।

রাস্তা পার হওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকার সময় এই কথা একজনের মনে হইয়াছিল। সহরের পথে হাঁটিতে হাঁটিতে শ্রান্ত ক্লান্ত একজন প্রৌঢ়বয়সী মানুষের।

গতি পথে, বৈচিত্র্য পথে, অস্থিরতা পথে। নদী আর নালার মত বড় বড় রাস্তা আর গলিতে মানুষের স্রোত, ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির প্রয়োজনে সমষ্টির শোভাযাত্রা।

সহরে পথ ছাড়া আর সমস্তই যেন আনুসঙ্গিক।

লাখ লাখ মানুষের কাছাকাছি থাকা চাই, যত কাছে পারে। কিন্তু গায়ে গা ঠেকাইয়া দাঁড়ানোর চেয়ে তো কাছাকাছি আসিবার ক্ষমতা নাই মানুষের, বিরাট এক প্রান্তরে যদি কয়েক লক্ষ মানুষ তেমনিভাবে জমাট বাঁধিয়া থাকে, তবু সেই ভিড়ের এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের দূরত্ব থাকিয়া যাইবে অনেকখানি, কাছে আসিতে প্রয়োজন হইবে পথের।

সহরের মানুষ তাই পথসর্ব্বস্ব।

সকালে পথে বাহির হয়, খোলা পথে অথবা সৌধরূপী দেয়ালঘেরা পথে দিন কাটায়। ঘুমানো দরকার, তাই অনেক রাত্রে শ্রান্ত দেহে শয্যার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। সে শয্যা কারও ফুটপাতে বিছানো ছেঁড়া কাপড়, কারও চৌকীতে বিছানো ছেঁড়া তোষক, কারও খাটের গদিতে বিছানো ফুল-আঁকা আস্তরণ।

পথ ছাড়া আর সমস্তই কি ফাঁকি ?

হাঁটিতে হাঁটিতে পা ব্যথা করিতেছিল। ক্লান্তিতে শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সহরের পথে হাঁটিয়া বেড়াইবার ঝোঁক তার কাটিয়া গিয়াছিল। বিড় বিড় করিয়া লোকটি নিজের কাছেই কি যেন সব কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল।

বাস তার গ্রামে, মানুষটি সে গ্রাম্য। দু'দিন আগে একটা কাজে সহরে আসিয়াছিল, আজ সকালে কাজ মিটিয়া গিয়াছে। দুপুরের গাড়ীতেই অনেক দূরের গ্রামটির দিকে তার রওনা হওয়ার কথা ছিল, একটা খেয়ালে ওই গাড়ীতে যাত্রা সে স্থগিত রাখিয়াছে।

কাজ শেষ হওয়া মাত্র একটা মুক্তির অনুভূতি জাগিয়াছিল, বড় বিস্বাদ অনুভূতি। অনেক দিন আগে, পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে, এই সহরে বিদ্যার্থীর জীবন যাপনের সময় মুক্তির যে উদ্‌ভ্রান্ত কামনায় সর্ব্বদা মন ব্যাকুল হইয়া থাকিত, তাই যেন পচিয়া গলিয়া মুক্তির মোহে পরিণত হইয়াছে; অন্ন যেমন পরিণত হয় মদে। পথ চলিবার চিরসাথী বগলের ছাতিটি ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া মানুষটা আজ অকারণে পথে পথে কত যে ঘুরিয়াছে! ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপরাহ্ণ বেলায় রাজপথের এই মস্ত চৌমাথার ধারে কি শ্রান্ত হইয়াই সে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে!

এখন আর কিছুই সে চায় না, পথের ওপারে গিয়া বাসে উঠিয়া হোটেলে ফিরিয়া যাইবে, নিমীলিত চক্ষে একটু বিশ্রাম করিবে হোটেলের আরামহীন শয্যায় গড়গড়ার নলের অভাবে অস্বস্তিকর আলস্যে, তারপর ছাতিটি বগলে করিয়া পুরাণো ব্যাগটি হাতে ঝুলাইয়া স্টেশনে গিয়া ধরিবে রাত্রের গাড়ী। সকালে সে গাড়ী তাকে তার গ্রামের কাঁকর-বিছানো নির্জ্জন স্টেশনে নামাইয়া দিবে। স্টেশন হইতে গ্রামের হাট পর্য্যন্ত পাকা বাঁধানো পথ, সেখান হইতে কাঁচা মাটির পথে মাইলখানেক হাঁটিলে তার ঘরের দুয়ার।

কাঁচা মাটির পথ? একি আশ্চর্য্য কথা যে সেই কাঁচা মাটির পথে তাকে সহরের দিকে যাত্রা সুরু করিতে হইয়াছিল, সহরে তার নিজের প্রয়োজন ছিল বলিয়া?

সে পথটিও কি সহরের জন্য ?

মাথাটা কেমন গুলাইয়া গেল,—পথের একেবারে মাঝখানে। দুরন্ত বেগে সে পথে অবিশ্রাম গাড়ী চলাচল করিতেছিল। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে এই সহরে সে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে আসিয়াছিল কিন্তু বাস তার গ্রামে, মানুষটা সে গ্রাম্য। দোতলা একটা বাসের নীচে চাপা পড়িয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে সে মরিয়া গেল।

পিতা স্বর্গে গেলেন। মনোমোহন ভাবিল, এবার তবে সহরে গিয়াই বাস করা যাক।

গ্রামের জ্ঞানী বৃদ্ধেরা গুজব শুনিয়া বলিলেন, 'জানতাম। আগেই জানতাম বাপ চোখ বুজবার পর বছর ঘুরবে না।'

মা বলিলেন, 'তাই কি হয় বাবা? এখানে যথাসর্ব্বস্ব ফেলে রেখে সবাই মিলে কলকাতা গিয়ে থাকব, এ যে পাগলের মত কথা বলছিস্ তুই।'

তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিলেন, 'তোর যদি সাধ হয়, যা না তুই, কিছুদিন বেড়িয়ে আয়গে না কলকাতা থেকে?'

মনোমোহন গম্ভীরভাবে বলিল, 'কিছুদিন বেড়িয়ে আসার কথা হচ্ছে না। কলকাতায় স্থায়ী বাসা করব।'

'ঘরদোরের কি হবে? বিষয় সম্পত্তির কি হবে?'—মা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এ সমস্যার সমাধান মনোমোহন মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। বাড়ীতে আশ্রিত এবং আশ্রিতার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। নিজেদের স্বচ্ছলভাবে ভালভাবে চলিয়া যায় এরকম বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও কর্ম্মহীন পরাশ্রয়ী ওদের অন্ন যোগাইতে গিয়া কোনদিন তাদের টানাটানি ঘোচে নাই। জোঁকও কষ্ট করিয়া জীবজন্তুর গায়ে নিজেকে সাঁটিয়া দিয়া রক্ত শোষণ করে—নিজের চেষ্টায়।

আর এই আশ্রিত আশ্রিতার দলটা তাদের বাড়ীতে বাস করিয়া তাদের অন্নবস্ত্র ধ্বংস করাটাই একমাত্র কাজ বলিয়া মনে করে, জন্মগত অধিকার বলিয়া গণ্য করে! তবু নিকট হোক, দূর হোক, সম্পর্ক একটা তাদের সকলের সঙ্গেই আছে। কলিকাতায় সঙ্গে নেওয়া না গেলেও এখানে তো তাদের থাকিতে দিতে হইবে।

পিসেমশায় এগার বছর সপরিবারে এ বাড়ীতে বাস করিতেছেন, সম্পর্কের হিসাবে তিনিই সকলের চেয়ে আপন, বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার ভারটা তাঁকে দিয়া গেলেই চলিবে। পিসেমশায় লোকটি তেমন চালাকচতুর নয়, এদিকে আবার টাকা পয়সার ব্যাপারে বিবেকটিও তাঁর তেমন সজাগ নয়। মাঝে মাঝে গ্রামে আসিয়া সে নিজে তদারক করিয়া গেলেও বিষয় সম্পত্তির ক্ষতি কিছু হইবেই। আদায়-পত্রের কিছু টাকা মারা যাইবেই।

কিন্তু এই ক্ষতিটা মানিয়া নেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

বড় লাভের আশা থাকিলে ছোটখাট অনিবার্য্য ক্ষতিকে মানিয়া নিতে হয়। সহরে সে বসিয়া থাকিবে না, উপার্জ্জন করিবে। নিজে উপস্থিত না থাকায় সম্পত্তির আয় যতটুকু কমিবে আর সহরে বাস করিতে খরচ যতটুকু বাড়িবে, তার চেয়ে অনেক বেশীই নিশ্চয় সে উপার্জ্জন করিতে পারিবে এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে।

সহরে টাকা রোজগারের অনেক সুবিধা, অনেক সুযোগ।

কেবল বাড়ীতে নয়, গ্রামেও সাড়া পড়িয়া গেল। এ যাওয়ার মানে সকলেই জানে, মনোমোহন আর দেশে ফিরিবে না। সহরে যারা যায়, গ্রামে আর তারা ফেরে না।

মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষ কবে এ গ্রামে আসিয়াছিলেন, বুড়া পীতাম্বর ঘটক সে খবর রাখে। খবরটা সে সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আগেও গল্পটা সকলে অনেকবার তার কাছে শুনিয়াছে।

একদিন দু'টি যুবক এক সঙ্গে এই গ্রামে আসিয়াছিল, তাদের একজন

পীতাম্বরের ঠাকুর্দার বাবা, একজন মনোমোহনের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। আজকের কথা নয়, তারপর শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামের কি তখন এ রকম লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা ছিল? কত শ্রী ছিল গ্রামের, কত ঐশ্বর্য্য ছিল, আজ গ্রামের ভাঙ্গা ঘরদুয়ার দেখিয়া কে তা কল্পনা করিতে পারিবে? মস্ত বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এই গ্রাম (কাছাকাছি নদী নাই, আশেপাশে বিশেষ কোন পণ্য উৎপন্ন হয় না, কোনোদিন হইত কিনা সন্দেহ। তবু কি করিয়া গ্রামটা মস্ত বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল সে কথা অবশ্য পীতাম্বরকে কেহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলে না)। রাজা এই গ্রামে বাস করিতেন (রাজবাড়ীর একটি ইঁট-পাথরের চিহ্নও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না)। ধরিতে গেলে এ গ্রাম তখন নগর ছিল বলা যায়।

পূর্ব্বপুরুষ দু'জন মলিন বেশে একদিন অবস্থার উন্নতির জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষটি ছিলেন বুদ্ধিমান, অল্পদিনেই তাঁর অবস্থা ফিরিয়া গেল। মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষটি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না। পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষটির কল্যাণে কোন রকমে তাঁর দিন কাটিয়া যাইত।

তারপর পীতাম্বরের ধর্ম্মভীরু পূর্ব্বপুরুষটি একদিন তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন, সমস্ত ভার দিয়া গেলেন বন্ধুকে, সরলহৃদয় বন্ধু চিরদিন যেমন তার বিশ্বাসী বন্ধুকে দিয়া যায়। তখনকার দিনে তো তীর্থ ভ্রমণ দু'দিনের সখের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই, তীর্থ সারিয়া আসিতে সময় লাগিত অনেক, ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিত কম। যে যাইত সে একরকম চিরবিদায় নিয়া যাইত।

দু'তিন বছর পরে, ঠিক কত বছর পরে পীতাম্বরের মনে নাই, তীর্থ সারিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, তার যথাসর্ব্বস্ব বন্ধু গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, স্ত্রী-পুত্রের অন্ন জোটে না।

পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষ বলিল, 'বন্ধু, এ কি?'

মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষ বলিল, 'কে তোমার বন্ধু?'

তাই পীতাম্বরের আজ এই অবস্থা। তবে ভগবান আছেন, বন্ধুকে ঠকাইয়া

মনোমোহনের পূর্ব্বপুরুষ যা পাইয়াছিল, আজ তার সিকির সিকিও নাই। মনোমোহনের বাপও কি সেদিন অপঘাতে মরে নাই, সহরের রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়িয়া মরে নাই? পাপের পুরস্কার হাতে হাতে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জয় তো ঘটিবেই।

পাপের শাস্তি যাইবে কোথায়?

'এই যে কলকাতা যাচ্ছে মনোমোহন, ওকে নেওয়াচ্ছে কে? তোমাদের বলে রাখছি শোন, সর্ব্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখিরি হয়ে ও যদি না ফিরে আসে দু'দিন পরে, ভগবান মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা। ছেলেমেয়ে যে হয়নি ওর, সে কার বিধান? প্রায়শ্চিত্ত ভগবান আর টানবেন না ঠিক করেছেন, ক'পুরুষ ধরে পাপের ধন ক্ষয় করিয়েছেন, ওর বাপটাকে অপঘাতে মেরেছেন, ওকে এবার সর্ব্বস্বান্ত করে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করাবেন, বংশটাও লোপ করে দেবেন।'

পীতাম্বরের গায়ের চামড়া ধবধবে সাদা, প্রথম বয়সে তামাটে ছিল। মাথার চুল, ভুরু, গোঁপ দাড়ি আর গায়ের লোমগুলি পর্য্যন্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। কথাগুলি বলিবার সময় আনমনে পৈতাটি সে আঙুলে জড়াইতেছিল, তার কথাগুলি তাই—পৈতা হাতে করিয়া অভিশাপ দেওয়ার মত শোনাইল।

পথের ভিখারী হইয়া একেবারে বংশলোপের অভিশাপ! বছর পাঁচেক মোটে বিবাহ হইয়াছে মনোমোহনের, ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় যায় নাই। এ স্ত্রীর সন্তান না হইলে আরেকটা বিবাহ করিতেই বা তার বাধা কিসের?

পীতাম্বরের বাড়াবাড়িটা অনেকের পছন্দ হইল না। পূর্ব্বপুরুষের গল্প বলিতে চাও বলো কিন্তু কবে কোন যুগে কি ঘটিয়াছিল, সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল কিনা ঠিক নাই, সে প্রসঙ্গ তুলিয়া আজ এভাবে মানুষকে শাপ দেওয়া কেন?

কেহ আপত্তি করিলে পীতাম্বর বলে, 'পাগল! আমি কেন শাপ দিতে যাব? আমি বলছি ভগবানের বিচারের কথা।'

পীতাম্বরের এতখানি গায়ের জ্বালার কারণটাও অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পীতাম্বর নিজেই বুঝাইয়া দেয়।

'মতিগতি ভাল হলে বংশটা হয়তো বজায় থাকতো কিন্তু ছোঁড়াটা বড় পাষণ্ড। ওর বাপ অপঘাতে মরেছে, কিন্তু মানুষটা সে মন্দ ছিল না। মাসকাবারে যখনি গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে সাতটি টাকা হাতে তুলে দিয়েছে, হাসিমুখে বলেছে, ধরতে গেলে সব কিছু তো আপনারই ঘটক মশায়, সাতটি করে টাকা আপনার হাতে দিতে লজ্জা হয়—কিন্তু করব কি বলুন, সে অবস্থা তো আর নেই। বাপ মরার পর বছর ঘোরে নি, এ ছোঁড়া কিনা ওমাসে আমায় খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে, স্পষ্ট বলে দিলে এখন থেকে আর একটি পয়সা দিতে পারবে না!'

সকলে মনে মনে বলে, তাই বল, এইজন্য তোমার এত রাগ!

'না দিলি, না দিলি টাকা, আমি কি চেয়েছি তোর কাছে? তোর বাপ ভক্তি করে দিত, তাই না তোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছি? মুখের ওপর কি কথা বললে শোনো। বললে, আপনার হিসেব তো বাবা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন ঘটক মশায়। আমি তো শুনে অবাক। বললাম, কিসের হিসেব বাবা? তোমার বাবা স্নেহভক্তি করে দিতেন, হিসেব তো কিছু ছিল না।'

কথা বলিতে বলিতে পীতাম্বর এমন যায়গায় থামিয়া যায় যে শ্রোতাদের প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হয়। একজন প্রশ্ন করে, 'তারপর কি হল?'

পীতাম্বর বলে, 'আমার কথা শুনে ছোঁড়া যেন খিঁচিয়ে উঠল, আপনার বাপ-দাদার সম্পত্তি ভোগ করার পাপ যেন না লাগে, সেই বাবদে আপনার সাতটাকা করে বরাদ্দ ছিল তো? তা সেই পাপেই যখন বাবাকে অপঘাতে মেরেছেন, আর তো আপনার পাওনা নেই।'

পৈতাটা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে পীতাম্বর বলে, 'শুনলে কথা? আমি যেন ওর বাপকে অপঘাতে মেরেছি! আরে, তোর পূর্ব্বপুরুষ করল পাপ, ভগবান তোর বাপকে দিলেন শাস্তি, তার মধ্যে আমাকে তুই জড়াস্ কেন! ভগবানের বিধান উল্টে দেবার ক্ষমতা থাকলে তোর বাপকে কি আমি বাঁচিয়ে রাখতাম না, অমন ভালমানুষ ছিল তোর বাপ!'

একজন শ্রোতা বলিল, 'ওর বাপ অপঘাতে মরেছে, একথাটা বলে বেড়ান আপনার উচিত হয় নি। মাসে মাসে তাহ'লে সাহায্যটা পেতেন।'

পীতাম্বর চটিয়া বলিল, 'সাহায্য? কিসের সাহায্য? আমি কি ভিখিরি যে ওর কাছে সাহায্য চাইতে যাবো? ভিখিরি হবে ও—দেখে নিও, ভিখিরি হয়ে ও ফিরে আসবে।'

গ্রামের লোকের প্রশ্ন আর উপদেশ বর্ষণে মনোমোহন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কলিকাতা গিয়া বাস করার উদ্দেশ্যটা সকলকে সে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে না, নিজের কাছেই উদ্দেশ্যটা তার স্পষ্ট নয়। সহরের কলের জল, বৈদ্যুতিক বাতি, ট্রাম বাস, সিনেমা থিয়েটার, সমারোহ, সভ্যতা এসব কি তাকে টানিতেছে? গ্রামের একঘেয়ে নিরুৎসব শান্ত জীবন ভাল লাগিতেছে না, তাই কি সে সহরের হৈ চৈ চায়? বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপা কি তার চাই? অথবা তার কামনা শুধু নূতনত্ব, পরিবর্ত্তন? এ রকম অনেক প্রশ্ন মনে জাগে, ভালমত একটা জবাবও সে খুঁজিয়া পায় না।

মনের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ শুধু অনেকদিন হইতে স্পষ্ট হইয়া আছে এবং কিভাবে যেন তার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে না পারাই তার এই অসন্তোষের কারণ। কেন তা কে জানে! কি যেন সব ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটিতে পারিতেছে না, অনির্দ্দিষ্ট অনেক সম্ভাবনা যেন বাতিল হইয়া যাইতেছে, দূরে কি যেন তার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, কাছে আগাইয়া যাওয়া হইতেছে না—এমনি এক অনাবশ্যক রহস্যময় অনুভূতি সর্ব্বদা তাকে পীড়ন করে আর গ্রামের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মন তার ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

সহরে গিয়া অর্থোপার্জ্জনের কথা অবশ্য সে ভাবে কিন্তু সেটা দেশের সম্পত্তির আয় কম হওয়া ও খরচ বাড়ার মধ্যে সামঞ্জস্য করার হিসাব। সহরে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করা তার আসল উদ্দেশ্য নয়।

সহরে গিয়া কোন উপায়ে যদি লাখপতি হইয়া যাইতে পারে তা হইলে অবশ্য তার আপত্তি কিছু নাই। কিন্তু সহরের আকর্ষণটা তার লাখপতি হওয়ার কামনার জন্য নয়।

নানা আপত্তি তুলিয়া, রাগ করিয়া চোখের জল ফেলিয়া মা ছেলের প্রস্তাবটা বাতিল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন মনোমোহনের প্রচণ্ড ধমকে তার চেষ্টা থামিয়া গেল।

ছেলের কাছে এই তার প্রথম ধমক খাওয়া। স্নেহের নয়, অভিমানের নয়, আদরের নয়, রাগ ও বিরক্তির ধমক। গরম মেজাজে বাড়ীর কর্তা যেভাবে ধমক দেয়।

আজ যেন মা আরেকবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁর ছেলের বাপটি বাঁচিয়া নাই।

তারপর হইতে মা একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। একটি কেবল অনুরোধ জানাইলেন ছেলেকে।

'কর্তার বার্ষিক কাজটা এখানে সেরে যা মনু।'

এ অতি সঙ্গত অনুরোধ। সে মানুষটার সারাজীবন এখানে কাটিয়া ছিল, দেশের লোকেও প্রত্যাশা করে যে তার প্রথম বার্ষিক কাজটা দেশেই সম্পন্ন হইবে। আগে সহরে গিয়া বাসা বাঁধিলেও এই কাজের জন্য সকলকে নিয়া তাকে অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য দেশে ফিরিতে হইবেই।

মনোমোহন বলিল, 'বেশ, তাই হবে।'

সহরে যাওয়া মাস তিনেক পিছাইয়া গেল।

মোটে তিন মাস, ত্রিশ বছরের সঙ্গে আর শুধু তিনটি মাস যোগ দেওয়া। সময় বিশেষে তিন মাস সময়ও কত যে দীর্ঘ হইতে পারে! তবে হ্যাঁ, বিদায় তাকে দিতে হইবেই জানিয়া গ্রাম যেন আয়োজন করিয়াছে তার মনোরঞ্জনের, এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এ গ্রামের স্মৃতি যাতে তার কাছে প্রীতিকর হয়।

প্রতিদিন ভোরে কে যেন এখন পূবের আম কাঁঠালের বন হইতে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া তুলিয়া সূর্য্যকে আকাশে স্থাপন করে, পাখীদের গান ঝরায়, বিল ছাইয়া পদ্ম ফুল ফোটায়, ধানের ক্ষেতে ঢেউ তোলানো বাতাসে পাঠাইয়া দেয় মুথা ঘাসের মেটে গন্ধ আর গাঁয়ের মানুষের কথায় ব্যবহারে আমদানী করে আন্তরিক প্রীতির অর্ঘ্য।

বিদায় হওয়ার অধীরতার মধ্যেও মাঝে মাঝে গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার কথা ভাবিয়া মনও বেশ খানিকটা কেমন কেমন করে বৈকি।

দুই

নিজে দেখিয়া পছন্দমত একটি ভাল বাড়ী ঠিক করিবার জন্য মনোমোহন প্রথমে একা কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসিল। উঠিল সহরের এক নামকরা হোটেলে—বাহিরের চাকচিক্যের তুলনায় ভিতরের আভিজাত্য যার বেশী।

কলিকাতায় পছন্দসই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা যে কি হাঙ্গামার ব্যাপার, সেটা মনোমোহনের একেবারে অজানা ছিল না। কিন্তু বাড়ী খোঁজার একটা দিক সে একবার খেয়ালও করে নাই। কেমন একটা যুক্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তার মনে জাগিয়া ছিল যে, সহরে যখন এত রকমের অসংখ্য বাড়ী, কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড় বাছাই করার মতই সহরে পৌছিয়া বাড়ী পছন্দ করিতে কোন কষ্ট হইবে না।

তিন দিন খোঁজাখুঁজির পর হয়রাণ হইয়া সে বুঝিতে পারিল, একটা বোকামি করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমে সহরের জানাশোনা কয়েকজন মানুষকে বাড়ীর খোঁজ নিয়া রাখিতে লিখিয়া, কিছুদিন পরে তার নিজের আসা উচিত ছিল।

বড় মন খারাপ হইয়া গেল।

ব্যাপারটা অতি সামান্য। চলনসই একটা বাড়ী এখনকার মত ঠিক করিয়া

সকলকে আনিয়া নীড় বাঁধিতে কোন বাধা নাই, তারপর ধীরে সুস্থে খোঁজ করিলে ভাল বাড়ী কি একটা পাওয়া যাইবে না? কিন্তু তিন দিন খুঁজিয়া মনের মত একটা বাড়ী না পাইয়াই মনোমোহনের মনে হইতে লাগিল, সহর যেন তাকে গ্রহণ করিতে চায় না। এ-যেন বিপজ্জনক ইঙ্গিত, তার বাড়ী খোঁজার চেষ্টার এই ব্যর্থতা। সহরে নূতন জীবন তার সার্থক হইবে না।

ভাড়াটে বাড়ী খুঁজিয়া না পাওয়ার ব্যর্থতা বোধ হয় মানুষের একাকীত্বের অনুভূতি তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে। সে অবস্থায় হোটেলের তিনতলার ঘরে অনেক রাত্রে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া নীচে রাস্তার দিকে চাহিয়া একাকীত্বের ভীরু হতাশার জন্যই বোধ হয় সন্দেহ জাগে যে, বিপ্লব হয়তো ভাল নয়, অভ্যাস মানুষের ধর্ম্ম, ভয়াবহ অধর্ম্মের চেয়ে মরণও ভাল।

নূতন আবেষ্টনীতে ঘুম আসে না। রাস্তার দিকে দু'টি বড় বড় জানালা, কিন্তু অপরদিকের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেই ঘরে আর বাতাস ঢোকে না। ফ্যান আছে, খুলিয়া দিলেই পাক্ দেওয়া বাতাস গায়ে লাগে, কিন্তু বহু লোকে যেন সঙ্গে সঙ্গে জোরে শ্বাস টানার মত ফিস্ ফিস শব্দে আপসোস জানাইতে সুরু করিয়া দেয়। জনবিরল পথে সশব্দে বাস চলিয়া যায়, রিক্সার টুন টুন আওয়াজ কাণে আসে,—অথচ সহরে তখন রাত্রির স্তব্ধতা সত্য, তার মধ্যে ফাঁকি নাই। অসংখ্য শব্দের বিপুল কলরোল থামিয়া যে গভীর স্তব্ধতা সৃষ্টি হইয়াছে, গ্রামের শ্মশানেও যার তুলনা নাই, মাঝে মাঝে মোটরের গর্জ্জন আর রিক্সার ঘণ্টাধ্বনি তাকে একটু নাড়াও দিতে পারে না।

শুধু স্পষ্ট করিয়া দেয়। কাণে যেন তালা লাগিয়া যায় আর শব্দহীনতা দপ দপ্ করিতে থাকে।

নটা-দশটার সময় হইতে রাত্রি দুটো-তিনটে পর্য্যন্ত শ্রান্ত দেহ যখন ঘুম চাহিয়া পায় না তখন হইতে প্রতিটি মিনিট মনমোহনের কাছে রাতজাগার কষ্টে ভারি ও মন্থর হইয়া থাকে।

তৃতীয় রাত্রি এমনিভাবে কাটিল।

পরদিন সকালে সে চিন্ময়ের বাড়ী গেল।

অনেকদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে এই সাক্ষাতের আনন্দ ও উত্তেজনা মনোমোহন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়া একদিন চিন্ময়কে একেবারে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য্য করিয়া দিবে: তাকে দেখিয়া সে সহরে বাস করিতেছে জানিয়া, সহরের কোন্ পাড়ায় কেমন একটি বাড়ী সে কিভাবে সাজাইয়াছে লক্ষ্য করিয়া, বন্ধু ও অতিথিকে বাড়ীতে আদর-অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থায় নিখুঁত মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া চিন্ময় ভাবিবে, কই না, মনোমোহন তো মোটেই পাড়াগেঁয়ে নয়! তিনবার তার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া তার সম্বন্ধে যে ধারণা চিন্ময়ের নিশ্চয় জাগিয়াছিল, এতকাল পরে সে ধারণা তার ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে একটি সাথীর অভাব তিন দিনের মধ্যেই তাকে এমন কাবু করিয়া দিল যে চমক দেওয়া আঘাতে চিন্ময়ের ধারণা পরিবর্ত্তন করার সাধটা বাতিল না করিয়া পারা গেল না। চিন্ময় আগেই জানিয়া রাখিবে যে সে সহরে বাস করিতে আসিতেছে।

জানুক, উপায় কি।

নাম-করা হোটেলটির চার্জ্জ বড় বেশী। মনে মনে খরচের হিসাব আওড়ানো মনোমোহনের অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ক'দিন এই অনাবশ্যক মোটা খরচের চিন্তাটা বড় বিঁধিতেছিল। আজ এই অপব্যয়ের সমর্থনে একটা ভালমত যুক্তি জুটিয়া যাওয়ায় সে স্বস্তি বোধ করিল।

চিন্ময় নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবে, সে কোথায় উঠিয়াছে—হোটেলের নামটা তখন নিঃসঙ্কোচে উচ্চারণ করা চলিবে!

চিন্ময়ের বাড়ীর সামনে বাগান আছে। কয়েক হাত মোটে চওড়া, তবু নিখুঁতভাবে সাজানো ফুলের গাছে ঠাসা বাগান। এটা সহরের এই নবোদ্গত অঞ্চলের ফ্যাশন। তিন কাঠা জমিতে যে বাড়ী করিয়াছে, সে-ও খানিকটা জমি

ছাড়িয়া দিয়াছে বাগানের জন্ত। তবে অনেকখানি যায়গা জুড়িয়া চিন্ময়ের মস্ত বড় বাড়ী। যত বড় নয়, নির্মাণ-কৌশলে তার চেয়ে বড় মনে হয়।

তাকে দেখিয়াই চিন্ময় খুসী হইয়া বলিল, 'মোহন? আশ্চর্য্য করে দিলে যে!'

অভ্যর্থনার আন্তরিকতাতেই কয়েক বছরের অদর্শনের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া যায়, দু'জনেই স্বস্তি বোধ করে।

আরেক দিক দিয়া মনোমোহন একটু বিস্ময়ও অনুভব করে।

কিছুদিন যোগাযোগ না থাকিলে মনের মধ্যে বন্ধুও কেমন বদ্‌লাইয়া যায়? দেখা হইলে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয়, এতো ঠিক সে নয়! এতদিন মনের মধ্যে বন্ধু বলিয়া যাকে স্মরণ করিতাম?

বন্ধুর সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া চিন্ময় বলে, 'তুমি সত্যি একটি আশ্চর্য্য মানুষ মোহন। যতবার গাঁ থেকে এসেছ, গাঁয়ের এতটুকু চিহ্ন তোমার কোথাও খুঁজে পাইনি। চুল ছেঁটেছ, তা-ও এখানকার সেলুনের ছাঁট। তোমাদের ওখানে সেলুন আছে নাকি? এতকাল গাঁয়ে থেকে এখানে আসবার সময় কি করে গাঁয়ের সব ছাপ ঝেড়ে ফেলে দাও?'

মনোমোহন বলে, 'পুকুর থেকে হাঁস যখন উঠে আসে—'

'গায়ে জল থাকে না। কিন্তু পায়ে পাঁক লেগে থাকে। পাঁক না থাকলেও দেখলেই বোঝা যায়, পুকুর থেকে উঠে এসেছে।'

'গেঁয়ো বলেই হয়তো সহরে সেজেছি।'

'সেজেছ কোথায়? সাজলে তো ধরাই পড়ে যেতে—চেনা যেত সহরের জামাই এসেছো!'

দুজনেই হাসে। দুজনেই পরস্পরের দিকে চাহিয়া গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। দুজনেই ভাবে যে শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন, আর রুচির দিক দিয়া প্রায় ভিন্ন রকম একজন মানুষের সঙ্গে অনায়াসে কেমন সহজ অন্তরঙ্গতা গড়িয়া তুলিয়াছে!

কিন্তু খানিক পরেই টের পাওয়া যায় দূরে সরিয়া থাকিলে বন্ধুর সঙ্গের সহজ অন্তরঙ্গতা বজায় থাকা এত সহজ নয়।

'তারপর, খবর কি ?'

চিন্ময়ের প্রশ্ন শুনিয়া মনোমোহন একটু দমিয়া যায়। অন্তরঙ্গতা বজায় আছে, কিন্তু জীবনের গত কয়েকটি বছরের হিসাবে তারা পরস্পরের অপরিচিত। যতই বিবরণ তারা পরস্পরকে দিক, সেগুলি হইবে শুধু বড় বড় কয়েকটি ঘটনার পরিচয়, অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সংবাদপত্রের রিপোর্টের মত। অসংখ্য ক্ষণগুলির খুঁটিনাটি বিচিত্র বিবরণ পরস্পরের অজানাই থাকিয়া যাইবে।

পাঁচ বছর আগে মনোমোহনের বিবাহের সময় চিন্ময় তার গ্রামের বাড়ীতে গিয়াছিল, কয়েকদিন থাকিয়া আসিয়াছিল।

সেই তাদের শেষ দেখা।

তারপর কিছুকাল ধরিয়া মাঝে মাঝে একজন আর একজনকে চিঠি লিখিয়াছে। বছর দুই আগে চিন্ময়ের বিবাহের সময় সে বন্ধুকে মস্ত একটি চিঠি লিখিয়াছিল।

সে চিঠির আগাগোড়া শুধু এই সমস্যার আলোচনা ছিল, সে কি সুখী হইবে? মোহন তো জানে, চিরদিন সে গ্রামের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, অনাড়ম্বর সহজ শান্ত জীবন সে পছন্দ করে। সন্ধ্যার অবশ্য তুলনা নাই, তাপস অথবা হিরণ্ময়কে বাতিল করিয়া সন্ধ্যা যে তার সঙ্গে জীবন কাটাইতে চাহিবে নিজের এই সৌভাগ্যে এখনও তার যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। তবু মনটা মাঝে মাঝে খুঁত খুঁত করে। মনে হয়, সন্ধ্যা যদি সহর হইতে অনেক দূরে কোন পল্লীতে গৃহস্থের অন্তঃপুরে বড় হইত আর বহুদিনের পরিচয়ের বদলে চিরন্তন প্রথামত একদিন দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়া আসিত এবং আরেকবার সমারোহে গিয়া সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়া আনিত, কি সুখীই সে হইত জীবনে!

—মোহন যেমন লাবণ্যকে নিয়া সুখী হইয়াছে।

চিঠি পড়িয়া মোহন ভাবিয়াছিল : এ কোন দেশী নেকামি? গ্রাম্য গৃহস্থের অন্তঃপুরে মানুষ হইলে সন্ধ্যা যে আর এই সন্ধ্যা থাকিত না, এটুকু বুঝিবার মত মত বুদ্ধি কি চিন্ময়ের নাই?

লাবণ্যও চিঠিখানা পড়িয়াছিল, স্বামীর সব চিঠিই সে পড়ে। রাগ করিয়া সে বলিয়াছিল, 'তার মানে আমাকে তোমার বন্ধু মুখ্যু গেঁয়ে ভূত মনে করে।'

চিঠির মানে তাই দাঁড়ায়। তবে মোহন বন্ধুকে জানিত কি না, তাই সে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল : 'না, ঠিক তা নয়। ওর কাছে গ্রামের মেয়ে হল কতকটা সেকালের ঋষিদের আশ্রমপালিতা কন্যার মত। রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি সব আছে, কাব্যের নায়িকার মত ভালবাসার খেলা জানে, অথচ এমন সরলা যে কাঁটা গাছে আঁচল আটকে গেলে—'

'তুমি থামবে?'

সে চিঠির জবাব মোহন দেয় নাই, চিন্ময়ের বিবাহেও আসে নাই। চিন্ময় অনেক অনুযোগ দিয়া আরেকখানা চিঠি লিখিয়াছিল এবং স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিল, সন্ধ্যার সঙ্গে কয়েকদিন কোন গ্রামে গিয়া বেড়াইয়া আসিবার কথা ভাবিতেছে।

চিঠির জবাব লিখিয়াও চিঠিখানা পোস্ট করিতে মোহন ভুলিয়া গিয়াছিল। তারপর এ পর্য্যন্ত দু'জনেই ছিল চুপচাপ।

খবরাখবরের আদানপ্রদান হইল প্রায় আধ ঘণ্টা, তারপর হঠাৎ মোহন বলিল, 'আসল কথাই এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি। সত্যি আমি গেঁয়ো। একজনের সঙ্গে জীবন কাটাতে কেমন লাগছে?'

'ভালই।'

আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করতে মোহন ভুলিয়া যায় নাই, চিন্ময় আপনা হইতে বলে কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। চিন্ময়ও বন্ধুর প্রশ্নের অপেক্ষায়

থাকায় আধ ঘণ্টার আলাপে সন্ধ্যার কথা একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। এইবার বিবাহোৎসবে না আসার এবং চিঠির জবাব না দেওয়ার একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করা মোহনের উচিত ছিল।

কর্ত্তব্যটা সে সম্পূর্ণ এড়াইয়া গেল।

চিঠির ইঙ্গিত ছিল খুব স্পষ্ট। মনোমোহন নিমন্ত্রণ করিলেই চিন্ময় ও সন্ধ্যা কয়েকদিনের জন্য তার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াইয়া আসিত। মোহন জবাব লিখিয়াও চিঠি ডাকে দেয় নাই।

তার মনে হইয়াছিল, এ চিঠি সন্ধ্যার ফরমাসে লেখা, গ্রাম্য আবেষ্টনীতে তাকে দেখিবার সখ হইয়াছে সন্ধ্যার। সন্ধ্যার কল্পনায় হয়তো সে ফতুয়া গায়ে দেয়, উবু হইয়া বসিয়া পাড়ার দশজনের সঙ্গে খোশ গল্প করে আর তার বাড়ীর শাঁখা সিন্দুর পরা ঘোমটা-টানা মেয়েরা কলসী কাঁখে পুকুরে জল আনিতে যায়। এসব নিজের চোখে দেখিয়া সন্ধ্যার একটু আমোদ পাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে।

খবরাখবরের আদানপ্রদান চলিতে থাকে, মোহনের জন্য চা আসে, দেয়ালের দামী ঘড়িতে কোমল ক্লান্ত আওয়াজে ধীরে ধীরে দশটা বাজে, সময়ের যেন তাড়াতাড়ি নাই।

সন্ধ্যার কাছে একটা খবর কি চিন্ময় পাঠাইবে না? এবেলা তাকে এখানে খাইয়া যাইতে বলিবে না একবার? শুধু এক কাপ চা আর খাবারে তার অভ্যর্থনার সুরু ও শেষ হইবে?

শেষের দিকে চিন্ময়কে কেমন অন্যমনস্ক মনে হইতেছিল, তারপর সে এক সময় বলে, 'এমন অসময়ে তুমি এলে মোহন! এখুনি নেয়ে খেয়ে আমায় আপিস ছুটতে হবে।'

'ও, আচ্ছা তাহ'লে উঠি।'

নিজের বোকামির জন্য মনোমোহনের আপসোসের সীমা থাকে না। 'এবার তুমি বিদায় হও' বলিবার সুযোগ চিন্ময়কে দেওয়ার আগেই অবস্থা বুঝিয়া তার নিজেরই বিদায় নেওয়া উচিত ছিল।

চিন্ময় কিন্তু ছাড়িতে চায় না, বলে, 'আরে, বোসো, বোসো। তোমার এত তাড়া কিসের? তোমার তো আপিস নেই! যতক্ষণ সময় আছে একটু গল্প করা যাক!'

মনোমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার বসে। এদের সঙ্গে কোনো-দিন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। এরা নিজেরাই ইঙ্গিতে জানায় আপিস যাওয়ার তাগিদ আছে, এবার তুমি বিদায় হও, আবার উঠিতে গেলে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে, এত তাড়া কিসের!

কয়েক মিনিট পরে নিজেই সে আপিসের কথাটা মনে করাইয়া দেয়।

চিন্ময় বলে যে চুলোয় যাক আপিস, সে কি কেরাণী যে লেট হইলে বড়বাবু গাল দিবে? বিশেষ একটা দরকারী কাজ আছে তাই না গেলে চলিবে না, নয় তো এতদিন পরে তাদের দেখা হইয়াছে, আজ কি আর চিন্ময় আপিস যাইত?

শুনিয়া মনোমোহন আবার দমিয়া যায়।

আগাগোড়া বিচারে যেন ভুল হইয়া যাইতেছে। চিন্ময় তবে তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য আপিসের তাগিদ জানায় নাই, অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না বলিয়া আপশোষ প্রকাশ করিয়াছিল? যে কোন ছুতোয় ছেলেমানুষের মত অভিমান করিবার এবং দোষ বাহির করিবার জন্য সে কি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে?

এতো ভাল কথা নয়।

সব অবস্থাতেই আত্মসমালোচনা মানুষকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয়। অন্যমনস্ক মানুষকে মনে হয় মনমরা উদাসীন। চিন্ময় দুঃখিত হইয়া ভাবে, জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া মোহন কি ঝিমাইয়া পড়িতেছে? গ্রামে থাকিয়াও সে কি সহরের বোঁটা-ছেঁড়া মানুষের মত বাসি হইয়া যাইতেছে?

'ওবেলা তোমার তো কোন কাজ নেই মোহন?'

'না।'

'সকাল সকাল আপিস থেকে বেরিয়ে তোমায় একেবারে তুলে নিয়ে আসব বাড়ী থেকে। ঠিকানাটা কি তোমার ?'

নামকরা হোটেলের সাহায্যে বন্ধুর কাছে মর্য্যাদা বাড়ানোর সাধ পচিয়া গিয়াছিল। একটু লজ্জার সঙ্গেই মোহন হোটেলের নামটা উচ্চারণ করিল।

'হোটেল ?' চিন্ময় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। 'আমি ভাবছিলাম, তোমার কোন আত্মীয়ের বাড়ী উঠেছ বুঝি। কিন্তু ও হোটেল কেন, কলকাতায় আর হোটেল খুঁজে পেলে না ? দশগুণ বেশী চার্জ্জ দিয়ে ওখানে উঠবার মানে ?'

'মোটে দুচার দিনের জন্য কিনা—'

'দু'চার দিনের জন্য মিছিমিছি টাকা নষ্ট করার কোন মানে হয় ? এক কাজ কর তুমি, ওবেলাই হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে সটান আমার এখানে চলে এসো।'

চিন্ময় একটু হাসিল।

'হোটেলের মত আরামে অবশ্য থাকতে পারবে না, তবে আমি যখন আছি, তুমিও থাকতে পারবে আশা করছি।'

মোহন হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিল না। এ বাড়ীতে দু'চারদিন বাস করার কথা ভাবিতেও তার ভয় হয়।

সত্যই ভয় হয়!

দেখা করিতে আসিয়া দু'চার ঘণ্টা কাটাইয়া যাওয়া এক কথা কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা বাস করা! দু'চার ঘণ্টা সোফায় শুধু বসিয়া থাকিতে হয়, মুখে শুধু বলিতে হয় কথা। অতিথি হইয়া চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে বাস করা তো সে রকম সহজ ব্যাপার নয়। পদে পদে তার গ্রাম্যতা ও অসভ্যতা ধরা পড়িতে থাকিবে, বাড়ীর চাকর দাসীরও বুঝিতে বাকী থাকিবে না আধুনিক সভ্য পরিবারে বাস করিতে সে একেবারেই অভ্যস্ত নয়।

'কাল চলে যাচ্ছি, এক বেলার জন্য হাঙ্গামা করে কি হবে ?'

চিন্ময়ের বাড়ীতে বাস করার বিপদকে বরণ করার চেয়ে দেশে পালানও ভাল।

অবশ্য, কালই যে যাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাওয়া ঠিক করিয়াও মানুষ অনেক ছুতায় যাত্রা পিছাইয়া দিতে পারে!

চিন্ময় সায় দিয়া বলিল, 'না, কাল যদি চলে যাও, তবে আর হাঙ্গামা করে লাভ নেই। কিন্তু তুমি কলকাতা এসেছ কেন তাতো বললে না?'

মোহন বলে, চিন্ময় শুনিয়া যায়। শুনিতে শুনিতে এমন মুখের ভাব হয় চিন্ময়ের, বন্ধু যেন আত্মহত্যার পরিকল্পনা শুনাইতেছে!

'সাধ করে দেশের বাড়ী ঘর ছেড়ে এসে তুমি কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে থাকতে চাও?'

'এখনকার মত বাড়ী ভাড়া নেব। তারপর দেখেশুনে কিছু জমি কিনে একটা বাড়ী করবার ইচ্ছা আছে।'

সবিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্ময় বলে, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ মোহন। তোমার মাথার ঠিক নেই।'

চিন্ময়ও সন্ধ্যাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, সন্ধ্যাও খবর পাইয়া আপনা হইতে উঁকি দিয়া যায় নাই।

সন্ধ্যার কথাটা মোহনকেই উল্লেখ করিতে হইল, তার সহরবাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্ময়ের সঙ্গে আলোচনা ও তর্কের পর বিদায় নেওয়ার সময়। সেই পুরাতন তর্ক, কলেজ জীবনে প্রতিদিন যে তর্কে তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। আজও ব্যক্তিগত আলোচনাটা মিনিট তিনেকের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল বহুরূপী সভ্যতার বহুমুখী পরিণতি ও সম্ভাবনার বিচারে এবং এক মুহূর্তে এতকাল দূরে দূরে থাকার জন্য দুজনের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধানটা গিয়াছিল বাতিল হইয়া। একটু যে সঙ্কোচ ছিল তাও কাটিয়া যাওয়ায় মোহনের পক্ষে যাচিয়া সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করার দাবী জানানো সহজ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ধ্যার কথা উঠিতেই চিন্ময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'বলিনি তোমায়? সন্ধ্যা তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে ?'

'বাপের বাড়ী গেছে, আবার কোথায়।'

'কবে গেল ?'

'তা পাঁচ ছ'মাস হ'ল বৈকি।'

'পাঁচ ছ'মাস ?'

বিস্ময়ের ভাব ফুটিতে ফুটিতে উত্তেজিত আনন্দের হাসিতে মোহনের মুখ ভরিয়া গেল, দু'হাতে সে চিন্ময়ের ডান হাতটি চাপিয়া ধরিল।—'খোকা, না খুকি ?'

'তার মানে ?'

ইঙ্গিতটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল চিন্ময়ের, তারপর তার মুখেও মৃদু একটু কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল—নিস্তেজ ও অস্থায়ী হাসি।

'ও, তাই বলো! স্ত্রীরা খোকা বা খুকি প্রসব করতে বেশীদিনের জন্য বাপের বাড়ী যায় আমার এটা মনে ছিল না। তুমি বুঝি সন্ধ্যাকে ওরকম সাধারণ স্ত্রী বলে ধরে রেখেছ ?'

মোহন চুপ করিয়া রহিল।

'খোকাখুকির ব্যাপারেই ও বাপের বাড়ী গেছে বটে, তবে ঠিক উল্টো কারণে। আমি খোকা খুকি চেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিলাম বলে আমাকে ঠেকাবার জন্য। এখন কিছুদিন ওসব হাঙ্গামা চায় না। বছর দুই পরে ফিরে আসবে বলেছে, তারপর যদি দরকার হয়, তোমার ওই কারণে গেলেও যেতে পারে বাপের বাড়ী। তার এখনো অনেক দেরী ভাই, অনেক দেরী।'

মোহন ভড়কাইয়া গিয়াছিল, কতকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝগড়া হয়েছে নাকি তোমাদের ?'

চিন্ময় ঝাঁঝালো ব্যঙ্গের সুরে বলিল, 'ঝগড়া ? আমরা কি তোমরা যে কোমর বেঁধে ঝগড়া করব আর দশ মিনিট পরে মুখের দিকে চেয়ে দু'জনেই হেসে ফেলব ? আমাদের মতের অমিল হয়েছে। ওসব তুমি বুঝবে না ভাই,, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

ব্যাপারটা মোহন বুঝিতে পারে ভাল ভাবেই। সন্ধ্যার প্রসঙ্গে চিন্ময়ের রাগ আর জ্বালার বহর দেখিয়া সে আর কিছু বলে না।

'চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত হোটেলে থেকো।'

মোহনকে বিদায় না দিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

বাড়ীর সামনে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তের মত বাগান, লতার চাঁদোয়ার নীচে কোলাপ্‌সিবল গেট।

চিন্ময়ের বাবা কেদারনাথ স্মার্ট আপিসি বেশে গাড়ীতে উঠিতেছিল। গতি-স্বপ্নের স্থির প্রতিমূর্ত্তির মত গাড়ীটির পালিশে সূর্য্যের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে মনে হয়। কেদারনাথের কাঁচা পাকা চুল একটু পাতলা হইয়া আসিয়াছে, টান করা মুখের চামড়া হয়তো একটু শিথিল হইয়াছে, নিষ্প্রভ হয় নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিবার পর সে মোহনের সঙ্গে কথা বলিল। মোহন গাড়ী ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কথা না বলিয়া উপায় ছিল না।

'মোহন নাকি? অনেকদিন পরে তোমায় দেখলাম।'

'ভাল আছেন?'

'আছি এক রকম। কি করছ এখন?

ছেলের স্কুল-কলেজ জীবনের অনেক অপরিচিত ছেলে অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দেখা করিতে আসে, চাকরী চায়। অনেকক্ষণ সাধারণ আলাপের ভূমিকায় সময় নষ্ট করে, প্রত্যেকে আগেই প্রমাণ করিয়া রাখিতে চায় যে অন্ততঃ তার জন্য কেদারের কিছু করা উচিত।

মোহনের বাড়ীর অবস্থা কেদারের মনে ছিল না, তাই প্রথমেই সে জানিতে চাহিল, সে বেকার কিনা অথবা কিছু করিতেছে। সময়ও অযথা নষ্ট হইবে না, মোহনের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা চলিতে পারে তাও বুঝা যাইবে।

মোহন ধীরে ধীরে বলিল, 'দেশেই আছি এখন পর্যন্ত। বাবা মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয়?

সহানুভূতি জানাইতে কেদার বলিল, 'মারা গেছেন? তাই তো, বড়ই দুঃখের কথা হল!'

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতে বলিল, 'চিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে? চিন্ময় বাড়ীতেই আছে।'

সঙ্গ ত্যাগ করার ভূমিকা হিসাবে বলিল, 'কটা বাজল? দশটা তেত্রিশ! দেরী হয়ে গেল একটু।—যাও।'

'যাও' সে বলিল ড্রাইভারকে। শোঁ করিয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

মোহন কখনো চাকরীর জন্য উমেদারী করে নাই কি না তাই কেদারের ব্যবহারে অমায়িকতার জোয়ার আসিবার আগেই ভাঁটা আসিল কেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

এজন্য বিস্মিত হওয়ার অবসর কিন্তু সে পাইল না, বিস্ময় জাগিল অন্য কারণে।

পথের ওপারে দু'টি নূতন তিনতলা বাড়ীর মাঝখানে একটি খোলার বাড়ী, মাটি লেপা দেয়ালে আলকাতরা মাখানো কাঠের গরাদের জানলা। খোলা দরজা দিয়া ভিতরে একটা মাচার খানিকটা অংশ চোখে পড়ে, সবুজ সতেজ পাতার মধ্যে কয়েকটা হলদে ফুল ফুটিয়া আছে, একটি পরিপুষ্ট কুমড়া ঝুলিতেছে।

ম্যাজিক নয়তো? এই পাড়ায় চিন্ময়ের বাড়ীর এত কাছে বাঁশের মাচায় কুমড়ো ফুল এবং ফল!

দুপুরে হোটেলের ঘরে বসিয়া মোহন লাবণ্যশ্রীকে একখানা চিঠি লিখিল। চিঠিখানা লিখিবার জন্যই দামী একখানা প্যাড কিনিয়া আনিল।

লিখিল:

আসবার আগের দিন তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করে তোমায় কাঁদিয়েছিলাম, অতটা বাড়াবাড়ি করা আমার উচিত হয়নি। সারাদিন তোমার সঙ্গে কথা বলিনি, বিকালে তুমি নিজে খাবার এনে দিয়েছিলে কিন্তু খাইনি, রাত্রে তুমি

কাঁদতে আরম্ভ না করলে হয়তো তোমার সঙ্গে ভাব না করেই কলকাতা চলে আসতাম।

আমার ওরকম জিদ চেপেছিল কেন জান? অনেকদিন একসঙ্গে থাকলে ওরকম হয়, সামান্য কারণে আপন জনের সঙ্গে সহজেই খিটিমিটি বেধে যায়। এখন বুঝতে পারছি, এই জন্য বৌদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাওয়া ভাল। আমি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, সেজন্য ('আমায় মাপ কোরো' লিখিয়া, একটু ভাবিয়া কথাগুলি মোহন কাটিয়া দিল) মনে দুঃখ রেখো না। সেকথা যাক, তোমায় একটা দরকারী কথা লিখতে চাই। আগেও অনেকবার এ বিষয়ে তোমায় বলেছি কিন্তু সামনাসামনি বলার জন্যই বোধ হয় কথাটা তোমার তেমন গুরুতর মনে হয় নি, অন্য প্রসঙ্গে চাপা পড়ে গেছে। এখন আমি কাছে নেই, দূর থেকে চিঠি লিখে জানাচ্ছি, হয়তো এবার আমার কথার গুরুত্ব খানিকটা বুঝতে পারবে।

তোমার ছেলেমানুষী এবার না কমালে তো চলবে না লাবু! তুচ্ছ বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠবে, সামান্য অনুযোগে কান্না আসবে, পাছে কেউ কিছু মনে করে ভেবে সর্ব্বদা সকলকে ভয় করে চলবে, জোর করে কিছু চাওয়াব বদলে দশ বছরের মেয়ের মত আব্দার ধরবে আর অভিমান করবে—এ স্বভাব তোমার বদলানো চাই। তুমি যে একটা মানুষ, তোমার যে স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে, তাই যদি তুমি ভুলে থাকো, নিজের জীবনকে তুমি সার্থক করে তুলবে কি করে? বিশেষতঃ কলকাতায় এলে আমাদের জীবনের প্রসার বাড়বে, দশজনের সঙ্গে তোমার মেলামেশা করতে হবে, সামাজিক জীবনের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে, নতুন ব্যবস্থায় সংসার চালাতে আমায় সাহায্য করতে হবে—এখনকার মত ছেলেমানুষ যদি থেকে যাও, এসব তো তোমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। ফল কি দাঁড়াবে ভেবে দেখো।—

ইতি—

তোমার মোহন

এখনো যে বাড়ী ঠিক হয় নাই, এ খবরটা মোহন লিখিল পুনশ্চে।

দোতলার দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিমে মুখ করা চিন্ময়ের একটি নিজস্ব বসিবার ঘর আছে।

বাড়ীর বাকী অংশের যে ঘর ও বারান্দা পার হইয়া এ ঘরে আসিতে হয়, তার সঙ্গে এ ঘরের অমিল নতুন মানুষকে রীতিমত চমক দেয়।

ঘরে কিছু নাই, একেবারেই কিছু নাই। পায়ের নীচে প্রশস্ত মেঝে, চারিদিকে ফাঁকা দেওয়াল, মাথার উপরে শুধু ছাদ!

বসিবার একটি আসন পর্য্যন্ত ঘরে নাই।

অপরিমিত শূন্যতার পরিবেশ জোরে শ্বাস টানিবার প্রেরণা জাগায়।

শুধু একটি সিল্কের লুঙ্গি পরিয়া খালি গায়ে খালি পায়ে চিন্ময় মেঝেতে বসিয়া পড়ে।

বলে, 'বোসো। ধূলো লাগবে না, ধূলো নেই।'

মোহন বসে।

পাঁচ ছ' বছর আগে ঘরখানা অন্যরকম ছিল। আলতা সিঁদুর গয়না আর রঙীন শাড়িতে জমকালো বৌয়ের বিধবা বেশ ধরার মত ঘরের চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুরু নরম ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিবার ব্যবস্থা ছিল আর ছিল বেতের মোড়া ও কাঠের পিঁড়ি। গড়গড়া ও রূপাবাঁধানো হুঁকা ছিল, পানের বাটা ও মসলার পাত্র ছিল, মাটির কুঁজো, পাথরের গ্লাস, তালপাতার পাখা ছিল। দেওয়াল ভরিয়া সাজানো ছিল পটের ছবি ও গ্রাম্য নক্‌সা।

শূন্য ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইতে বুলাইতে মোহন কেবল একটি কথায় প্রশ্ন করে, 'কেন?'

চিন্ময় বলে, 'কি করব? গ্রামের গেরস্থ ঘরে যা কিছু থাকে সব এনেছি, কমদামী সব জিনিস কিনেছি, কিন্তু ঘরোয়া ভাবটা কিছুতে আনতে পারিনি।

কখনো মনে হয়েছে ঘরে জঞ্জাল জমেছে, কখনো মনে হয়েছে নতুন একটা সহুরে ফ্যাসান সৃষ্টি করেছি, কখনো মনে হয়েছে এবার বুঝি ক্যামেরা এনে শুটিং সুরু হবে। কোথায় যেন একটা ফাঁকি ছিল ধরতে পারিনি। সব তাই ছেঁটে ফেলেছি। ফাঁকি বজায় রেখে চলার চেয়ে এই রকম ফাঁকাই ভাল। মাঝে মাঝে এসে বসলে মনটা বেশ শান্ত হয়।'

মোহন জিজ্ঞাসা করে, 'সেই যে তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে ক'দিন ছিলে, তারপর আর গ্রামে গিয়ে থেকেছ কখনো?'

চিন্ময় বলে, 'থাকি নি, তবে মাঝে মাঝে সকালে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে এসেছি। গত রবিবারের আগের রবিবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। নরেশকে মনে পড়ে? তাদের দেশের বাড়ীতে। তাদের বাড়ীতে অবশ্য বেশীক্ষণ থাকিনি, পুকুর পাড়েই সময় কেটেছিল। মস্ত একটা মাছ ধরেছিলাম। তুলতে কি পারি, অনেকক্ষণ খেলিয়ে তবে তুললাম।'

'কত বড় মাছ?'

'সের দুই হবে।'

দুসেরি একটা মাছ মস্ত বড় মাছ চিন্ময়ের কাছে।

তাদের মস্ত পুকুরটা এখন জেলেদের কাছে জমা দেওয়া হয়, আজ কাল দু'সেরি মাছ তার কাছেও অবশ্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু ওই পুকুর হইতে ছিপে সে কতবার সাত আট সের ওজনের রুই কাতলা ধরিয়াছে—খুব বেশীদিনের কথা নয়।

সে কথা চিন্ময়কে বলিয়া লাভ নাই। সে বুঝিবে না।

বড় মাছ ছিপে গাঁথিয়া ধরার সুখ আর বড় মাছ রান্না করিয়া খাওয়ার সুখের পার্থক্য তার জানা নাই।

মাছ ধরার সুখের স্বাদটা তার জানা আছে কিন্তু সুখটা পাওয়ার আগ্রহ আছে কি? জেলেদের পুকুরটা জমা দিলেও ছিপ ফেলিবার অধিকার সে হারায় নাই। কিন্তু গত কয়েক বছরে কতবার সে পুকুরে ছিপ ফেলিতে গিয়াছে?

একেবারেই তাগিদ অনুভব করে নাই।

মোহন জিজ্ঞাসা করে, 'শীতকালে খালি মেঝেতে বসো কি করে?'

চিন্ময় হঠাৎ জবাব দেয় না।

মোহন বুঝিতে পারে হঠাৎ সে ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছে—মুখ বন্ধ করিয়া সে রাগটা সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে। চিন্ময় মুখ খুলিলে তবে মোহন তার রাগের কারণটা বুঝিতে পারে। তার প্রশ্নটাকে ব্যঙ্গ মনে করিয়া চিন্ময়ের রাগ হইয়াছে!

রাগ আয়ত্তে আসিলে চিন্ময় ধীরে ধীরে বলে, 'হাসি পেলে হেসো মোহন। এর চেয়ে তাতে কম ঘা লাগবে মনে। তুমি পনেরো সের মাছ তুলেছিলে মনে আছে কিন্তু আমি জীবনে কখনো ছিপে মাছ ধরিনি। আট দশ সেরি মাছ তুমি হেসে খেলে তুলে থাকো।'

ছিপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য মোহন সত্যই শীতকালে খালি মেঝেতে বসার সমস্যাটা টানিয়া আনিয়াছিল। সে লজ্জিতভাবে বলে, 'মনে মনে হাসি নি ভাই, কথাটা শুধু চাপা দিচ্ছিলাম। ছিপে মাছ ধরতে তুমি যে অনাড়ি, সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। মুখে বলে কি হবে?'

সন্ধ্যার সময় চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল,—বড় একটি মাটির প্রদীপ। শূন্য প্রদীপের শিখাকে কাঁপিতে দেখিয়া তখন মোহনের মনে হইল সহর সত্যই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু গ্রাম কাছে আসে নাই!

লোকালয়ের বাহিরে গৃহহীন তরুহীন প্রান্তরে শুধু একটি আলো সম্বল করিয়া তারা বসিয়া আছে। অনেকবার তার দেশের গ্রামের উত্তরে রঙ্গনাথের মাঠে বসিয়া সে দূরে আলো জ্বলিতে দেখিয়াছে। সে আলো একটি নয়, অনেকগুলি।

মোহন অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, সন্ধ্যার কথা না উঠা পর্য্যন্ত কোন কথাই তার ভাল লাগে না। চিন্ময়ের মুখে সন্ধ্যার সঙ্গে তার বিরোধের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তার মনে হয়, এই ঘরখানা যেন সেই মনান্তরের কারণটির সহজ সরল

ব্যাখ্যার মত। এত বড় বাড়ীতে এই একটিমাত্র ঘর যেমন চিন্ময়ের পাগলামির প্রত্যক্ষ পরিচয়, সন্ধ্যার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন মিলের মধ্যে একটিমাত্র অমিলও তেমনি তার বিকারের প্রমাণ।

বিবাহের আগে চিন্ময় তাকে চিঠিতে যা লিখিয়াছিল, মোহন আগেই জানিত সেসব বাজে কথা। কোন মন চিরদিন রূপকথার রাজকন্যার গায়ে সোনার কাঠি ছোঁয়ায় না। রাজকন্যার ঈর্ষা নাই, মানুষীর সঙ্গে মানুষের সুখের ঘরকন্নায় সে বাধা দেয় না। কোন অজানা কারণে মোহনের রাজকন্যা বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কন্যা সাজিলেও সেজন্য সন্ধ্যাকে নিয়া তার অসুখী হওয়ার কথা নয়।

সন্ধ্যা ঘোমটা টানিয়া অন্তঃপুরচারিণী সাজিলেই বরং তার অসুবিধার সীমা থাকিত না। নিজে সে যে জীবন যাপন করে,—এই ঘরে খেয়ালের বশে মাঝে মাঝে দু'এক ঘণ্টা অবসর যাপন করা ছাড়া—তাতে সন্ধ্যা যেমন আছে তেমনি না হইলে জীবনসঙ্গিনী তাকে করা চলিত না। তাই ঘরে ও বাহিরে সন্ধ্যার সাজপোষাক চালচলনের এতটুকু সংস্কার চিন্ময় দাবী করে নাই শুনিয়া মোহন আশ্চর্য্য হয় না।

'আমি কিছুই চাইনি ভাই, শুধু একটি ছেলে চেয়েছিলাম। আমারি মতে বেশী বয়সে বিয়ে হলে প্রথমেই ছেলেমেয়ে হওয়া ভাল—অন্ততঃ একটি। ও বললে পাঁচ বছরের মধ্যে ছেলেমেয়ে হওয়া চলবে না, পাঁচ বছর পরে দেখা যাবে। প্রথমে হাসতে হাসতেই আলোচনা হত, তারপর আমি যত জোর করতে লাগলাম, ওর জিদও তত চড়তে লাগল। শেষে একদিন বাবার কাছে চলে গেল। কি বলে গেল জানো? পাঁচ বছর পূর্ণ হলে ফিরে আসবে।'

'পাঁচটা বছর ধৈর্য্য ধরলেই পারতে? দেখতে দেখতে কেটে যেত।'

'কেন? বিয়ে কি ছেলেখেলা? একজন ক'মাস হৈচৈ করে বেড়ানো বন্ধ রাখতে পারবে না বলে আরেকজন পাঁচ বছর ধৈর্য্য ধরবে, আমি ওসব ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসি না। তাছাড়া, বার্থ কণ্ট্রোল আমার অতি কদর্য্য মনে হয়।'

'তুমি কদর্য্য ভাবলেই তো নেসেসিটি কথা শুনবে না। সভ্য জগতের দরকার, তাই ওটা চল হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামে নিতাই বলে একজন ডাক-পিয়ন আছে। দশ বার বছর বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে ছ'টি। খেতে দিতে পার না। একদিন পাগলের মত ছুটে এসে আমাদের হাসপাতালের—'

'তোমার হাসপাতাল আছে নাকি ?'

'বাবা একটা করেছিলেন ছোটখাটো। আরও দশ গুণ বড় একটা দরকার, কিন্তু করে কে ? বাবারও অত পয়সা ছিল না, আমারও নেই।' মোহন একটু হাসে, 'নিতাই এসে হাসপাতালের ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে গেল। পেটের নতুন ছেলেটাকে পেটেই মারবার জন্য বৌকে কি যেন সব খাইয়ে দিয়েছিল, বৌটা নিজেই মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করে ডাক্তার আমার পরামর্শ নিতে এল, নিতাইকে পুলিশে দেবে কি না। আমি বলিলাম, না, ওকে বার্থ কন্ট্রোল শিখিয়ে দিন। এ হ'ল বছর দুই আগের কথা। কিন্তু শেখালে কি হবে, ওসব কি ধাতে পোষায় নিতাইদের ? আরেকটি বাচ্চা হয়েছে নিতাই-এর বৌয়ের—এবার আর কোন গোলমাল করে নি। ডাক্তার আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিল। কিন্তু নিতাই বলে অন্য কথা।'

'কি বলে ?'

'বলে, না বাবু, ওসব ভাল নয়। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি বললাম, তবে সেবার ওরকম কাণ্ড করতে গিয়েছিলি কেন ? বৌটা মরত, নিজে জেল খাটতে!' নিতাই বলল, 'অত বুঝিনি বাবু। ছেলেপিলে কটার দশা দেখে মরিয়া হয়ে পাপ করেছি।'

'আমার ছেলেমেয়েকে খেতে পরতে দেবার ক্ষমতা আছে।'

চিন্ময় বিরক্ত হইয়াছে। সন্ধ্যার সম্বন্ধে এত বড় গুরুতর কথা আলোচনা করার সময় গ্রামের নিতাই পিয়নের গল্প আরম্ভ করা বোধ হয় তার উচিত হয় নাই।

কিন্তু গ্রামকে, গ্রামের সরল শান্ত জীবনকে ভালবাসিতে গেলে নিতাই

পিন্নেনের সমস্যাটা তুচ্ছ করা যায় কেমন করিয়া? গ্রামের মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক অশিক্ষা কুসংস্কার এসব বাদ দিয়া গ্রাম্য জীবন কল্পনা করা যায় কি করিয়া?

তাকে একেবারে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া চিন্ময় বিরক্ত হওয়ার জন্য লজ্জিত হয়, ধীরে ধীরে বলে, 'আসল নীতিটাই তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ মোহন। কারো কারো বেলা সত্যিকারের অজুহাত থাকতে পারে—যেমন ধর, স্বাস্থ্যের জন্য যদি দরকার হয়। কিন্তু খেতে পরতে দিতে পারবে না, স্বাধীন চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটবে—এসব কি বার্থ কণ্ট্রোলের অজুহাত? নিতাই ছেলেপিলেকে খেতে দিতে পারে না, সেটা একেবারে আলাদা একটা অন্যায়। নিতাই অন্যায়টা মানবে কেন? সে ভগবানের দোহাই দেয়—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। কিন্তু আসল কথাটা তো ঠিক। আহারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রকৃতির নিয়মেই মানুষ বাড়বে কমবে—সেজন্য বার্থ কণ্ট্রোল দরকার হয় না। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে বলেই মানুষ মরতে মরতে দুর্ভিক্ষ ঠেকাবার ব্যবস্থা করবে। মানুষ জন্মানো বন্ধ করে কি দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায়? গরীব সুখে থাকে?'

হঠাৎ চিন্ময় হাসে।

'প্রায় বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম ভাই। সন্ধ্যা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে এদিক থেকে একটা উপকার করেছে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে মাথা অনেকটা সাফ হয়ে এসেছে।'

আচমকা সে প্রশ্ন করে, 'তোমার কি তবে এই ব্যাপার? সহরে আসবে, স্বাধীনভাবে দু'জনে স্ফূর্তি করবে, তাই ছেলেমেয়ে চাও না?'

মোহন বলে, 'এবার আমার রাগ করা উচিত। লাবণ্যকে ডাক্তার দেখাতে কলকাতা এসেছিলাম মনে নেই?'

'সত্যি মনে ছিল না ভাই!'

'তোমরা কি এ ঘরেই থাকবে দাদা?'

গত পাঁচ বছরে ঝরণা বড় হয় নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে। চিন্ময় স্নান করিতে যায়, ঝরণার সঙ্গে মোহন যায় নীচে সকলের বসিবার ঘরে।

সেখানে ঝরণার বন্ধু লীলা আর তার স্বামী বসিয়াছিল।

লীলাকে মোহন চিনিত। পাঁচ বছরে সেও বড় হয় নাই, একটু রোগা হইয়া গিয়াছে। প্রদীপের আলোয় ঝরণাকে মোটা মনে হইয়াছিল, এখানে বিদ্যুতের আলোয় লীলাকে দেখার পর ঝরণার দিকে চাহিয়াই সে বুঝিতে পারিল, ঝরণা শুধু স্পষ্ট হইয়াছে, মোটা হয় নাই। অন্য এক যুগের স্বপ্ন সামঞ্জস্য হারানোর ভয়ে কবি ও শিল্পীর মারফতেও কল্পনা যে সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই, ঝরণা যেন সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে।

ঝরণা নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন। না হইয়া উপায় কি? তার বিপদ কেউ বুঝিবে না। ঝরণার হাসি মিলানো মুখ ও কঠিন দৃষ্টির তিরস্কারে হঠাৎ সচেতন হইয়া মোহন তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চাহিয়া সিগারেটের জন্য পকেট হাতড়াইতে আরম্ভ করে।

লজ্জায় তার কাণ গরম হইয়া ওঠে।

গ্রামে পুকুরঘাটে একটি স্ত্রীলোক গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া অসভ্য অবিবেচক মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেছে, সহুরে ভাবে সেই রকম একটা কুৎসিত কাণ্ড যেন ঘটিয়া গেল।

চুপ করিয়া থাকা আরও ভয়ঙ্কর। লীলাকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার মা ভাল আছেন?'

লীলার গলা খুব মৃদু, অতি ধীরে ধীরে সে কথা বলিত। এখনো তার কথা যেন দূর হইতে ক্লান্ত হইয়া কাণে আসিয়া পৌছায়, কেবল তার নিঃশব্দ ক্ষীণ হাসিতে ধারালো দুষ্টামি আছে মনে হয়!

'মা ভালই আছেন। আমি খুব বুড়ী হয়ে পড়েছি, না? ঝরণার মত আমাকেও তুমি বলতেন, আজ যেন আপনি হয়ে গেছি মনে হচ্ছে?'

আর একটু হইলেই বুদ্ধিমানের মত জবাব দেওয়ার কথাগুলি ফসকাইয়া যাইত,

জড়াইয়া জড়াইয়া হয়তো মোহন বলিয়া বসিত, 'না না. তা নয় তা নয়—।' লীলার চেনা হাসি হঠাৎ তাকে প্রেরণা জোগায়, সে বলে, 'ছফুট একজনকে সঙ্গে এনেছ, হঠাৎ তুমি বলতে কি সাহস হয় ?'

সকলে হাসে।

ঝরণা বলে, 'আমায় খোঁচা দেওয়া হল। আজ পর্য্যন্ত পাঁচ ফুট একজন সঙ্গীও জোটাতে পারিনি।'

মোহন স্বস্তি বোধ করে। খুসীও হয়। গ্রামের স্ত্রীলোক গালাগালি দেয়, ক্ষমাও করে নীরবেই। এরা চোখের দৃষ্টিতে শাসন করে আবার ক্ষমাও করে।

পরে সে চিন্ময়কে ব্যাপারটা বলে। সরলভাবে প্রাণ খুলিয়া বলে।

'এমন লজ্জা পেলাম ভাই! আমার মনে কিছু নেই, অবাক হয়ে দেখছিলাম যে কায়দা জানলে কত সিম্পল্ ভাবে রূপকে কি আশ্চর্য্যরকম ফুটিয়ে তোলা যায়। গেঁয়ো মানুষ, খেয়াল ছিল না ওভাবে তাকাতে নেই।'

'তাকালে দোষটা কি ? এ হল ঝরণার ন্যাকামি। সবাই দেখবে বলেই তো সাজগোজ করেছে! সোজাসুজি খোলাখুলি স্পষ্টভাবে চেয়ে দেখলেই বুঝি দোষ হয়ে গেল ?'

একটু থামিয়া চিন্ময় নালিশের সুরে আবার বলে, 'তোমার কাছে গ্রামের সব কিছুই খারাপ। কেউ অসভ্যতা করলে মেয়েরা সোজাসুজি গালাগালি দেবে—সেটাই তো উচিত। কিন্তু ওরকম কি সত্যি ঘটে ? আমি তো দেখেছি একঘাটে মেয়েপুরুষ কয়েক হাত তফাতে নাইছে—পুরুষেরা আগাগোড়া মেয়েদের দিকে পিছন ফিরে থাকে, তাও দেখেছি।'

মোহন বলে, 'তা না হলে কি চলে ? সবাইকে পুকুরেই তো যেতে হবে। কাজেই ওরকম নিয়মনীতি দরকার। মেয়েরা নাইছে বলে তুমি এক ঘণ্টা হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ? ওদের দিকে পিছন ফিরে একটু তফাতে তোমার নাওয়ার কাজ সেরে তুমি চলে যাও!'

চিন্ময় খুসী হইয়া বলে, 'তবে ? ত্যাখো তো কি সহজ সুন্দর নিয়ম।'

পরদিন চিন্ময় একটি বাড়ীর খবর দিল।

জগদানন্দ নামে এক ধনী আছে, তার গোটাকয়েক বাড়ী আছে কলিকাতায়। চিন্ময়ের বাড়ী সহরের যে অঞ্চলে সেই অঞ্চলেই তার একটি বাড়ী খালি আছে। একটু ঘুরিয়া যাইতে না হইলে চিন্ময়ের বাড়ী হইতে এ বাড়ীতে হাঁটিয়া আসিতে মিনিট পাঁচেকের বেশী সময় লাগিত না।

বাড়ী দেখিয়া মোহনের খুব পছন্দ হইয়া গেল। আধুনিক ধাঁচের নতুন বাড়ী, জ্যামিতিক গঠন-বৈচিত্র্যে একটু ধাঁধার মত।

ভাড়ার অঙ্কটা শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল না। এ এলাকায় এরকম একটা বাড়ীর ভাড়া যে বেশী দিতে হইবে এটা তার জানাই ছিল।

পরদিন মোহন বাড়ী ফিরিয়া গেল। বাড়ীওলার সঙ্গে কথা বলিয়াছে চিন্ময়, বাড়ীটা ভাড়া করার ব্যবস্থাও সেই করিবে।

তিন

বাপের বার্ষিক শ্রাদ্ধে মোহন খুব সমারোহ করিল।

দেশে এই তার শেষ সামাজিক কাজ, সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পরেও বহুদিন যেন মানুষ তার প্রশংসা করে।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসিল, বন্ধু-বান্ধবেরা আসিল, একটি বৃষ উৎসর্গ করা হইল, নানা জাতের আরও অনেক লোক ছাড়া শুধু ব্রাহ্মণই ভোজন করিল সাড়ে সাতশো, দু'হাজার কাঙ্গালীর পেট জীবনে হয়তো এই প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার ভরার মত ভরিয়া গেল।

চিন্ময় আসিয়া তিন দিন থাকিয়া গেল। এত টাকা খরচ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধে এমন সমারোহ করিয়াও বন্ধুর কাছে সে কিন্তু প্রশংসা পাইল না।

চিন্ময় স্পষ্টই বলিল, 'লোকজন খাওয়াচ্ছ তাতে কিছু বলার নেই। বাজে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এত টাকা নষ্ট করার মানে হয়?

'না করলে লোকে নিন্দা করবে।'

আত্মীয়েরা সকলে বিদায় নেওয়ার আগেই মোহন আরেকবার কলিকাতায় গেল। টেবিল চেয়ার সোফা আলমারি কাঁচ ও চীনা মাটির বাসন, কার্পেট পর্দ্দা আলো পাখা ইত্যাদি অনেক রকম জিনিষ কিনিয়া ভাড়াটে বাড়িটি ছবির মত সাজাইয়া ফিরিয়া আসিল।

দেশের বাড়ি হইতে সেকেলে জমকালো চেহারার তিনটি খাট আর বাছা বাছা কয়েকটি আসবাব ও জিনিষ কেবল নেওয়া হইবে। বাকী অধিকাংশই গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট। সহরের সে বাড়িতে সেগুলি মানাইবে না।

লাবণ্যশ্রী চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'বাক্স নেব না?'

'নেব। কিন্তু খাটের নীচে ঘরের কোণে পাহাড় করে রাখতে পাবে না। সব একটা গুদাম ঘরে থাকবে।'

'একটা রুমাল বার করতে গুদাম ঘরে যাব?'

'সর্ব্বদা যা দরকার, সে সব কি আর বাক্সে থাকবে? রুমাল থাকবে তোমার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে, আরও অনেক কিছু থাকবে। ড্রেসিং টেবিল্‌টা যা কিনেছি তোমার জন্যে—'

স্বামীর পছন্দে কিন্তু লাবণ্যশ্রীর একেবারেই বিশ্বাস নাই।

'একবারটি আমায় দেখিয়ে কিনলে পারতে। সত্যি বড় ব্যস্তবাগীশ মানুষ তুমি!'

লাবণ্যের রূপে এমন একটা কোমলতা আছে যে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, তার বড় জম্‌কালো রঙীন শাড়ী পরার সখ, ঘষিয়া মাজিয়া ক্রীম্‌পাউডার দিয়া রূপকে তীক্ষ্ণ করার দুরন্ত সাধ। প্রক্রিয়াটা মোহন পছন্দ করে কিন্তু ফলটা তাকে দমাইয়া দেয়। সন্ধ্যা কিভাবে প্রসাধন করিত সে জানে না, মনে হইত উজ্জ্বল হইয়াও মুখখানা যেন তার কোমল হইয়াছে। অথচ

প্রসাধনের পরে লাবণ্যের মুখখানা শুধু চকচকে হয়, শ্রী থাকে না। হয়তো লাবণ্যের মুখ সন্ধ্যার মুখ নয় বলিয়া। অথবা হয় তো নিজের রূপকে ঘষামাজা করার কলা কৌশল লাবণ্য জানে না। তবু রূপ যে ভাবে কাটে না লাবণ্যের ধারে কাটে, এটা জানা থাকায় মোহন মুখ মাজাঘষার চেষ্টায় স্ত্রীকে প্রশ্রয় দেয়, উৎসাহও দেয়।

সহরে যাইতে লাবণ্যেরও খুব আগ্রহ এবং উৎসাহ।

ধরিতে গেলে তার পরাধীন বধূজীবনের অন্ত হইয়াছে, মোহন কর্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও সংসারের কর্ত্রী হইয়াছে, রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে রাজার ছেলের বৌ যেমন রাণী হয়।

কিন্তু এতদিন ধরিয়া শাশুড়ী ননদ গুরুজনদের কাছে ভীরু লাজুক বৌ সাজিয়া থাকা এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে মোহনের হুকুমেও সে নিজেকে বদলাইতে পারিতেছে না, বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা কাজে লাগাইতে পারিতেছে না নিজের নূতন পদমর্য্যাদায়। নূতন জায়গায় নূতন বাড়ীতে গেলে হয়তো কাজটা সহজ হইতে পারে। ক্রমাগত যে দায়িত্বের কথা বলিয়া মোহন তার মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে, সে দায়িত্ব হয়তো সেখানে পালন করা কঠিন হইবে না।

আরও একটা কারণ আছে তার উৎসাহের।

সে কারণটাও তার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যাওয়ার চার পাঁচদিন আগে সে মোহনকে খুসীর সঙ্গে বলে, 'এক হিসেবে ভালই হবে, একটু ভালরকম চিকিৎসা হবে আমার। এ ব্যথা সত্যি আর সইতে পারি না।'

মোহন সায় দিয়া বলে, 'হ্যাঁ, আমিও সে কথা ভেবে রেখেছি, একজন ভাল ডাক্তার দেখাব তোমাকে।'

'বেশ বড় একজনকে দেখিও, সস্তায় সেরো না। একশো টাকা ভিজিট লাগে, দিও! এখন তো তোমার হাত।'

মোহন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, 'আবার? আবার এভাবে কথা বলছ? এমন করে কথা বলো তুমি, তোমার যেন কোন দাবী নেই, অধিকার নেই। তুমি না লেখাপড়া শিখেছো?'

'পরীক্ষা দিলে অনার্স পেতাম—ফার্ষ্ট ক্লাস। দিতে দিলে কই?' লাবণ্য মুচকিয়া হাসে।

এই একটিমাত্র ভরসা তার সম্বন্ধে মোহন করে, তার কিছু পড়াশোনা করা আছে। তার গরীব বাপ মেয়েকে স্কুল কলেজে পড়াইতে, তালি দেওয়া জুতোজামা পরিয়া দিন কাটাইয়াছে। এটা অবশ্য তার কন্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ অথবা উদারতার প্রমাণ নয়—আরও অনেকেই যে হিসাবে মেয়েকে লেখাপড়া শেখায়, তারও ছিল সেই একই হিসাব। লেখাপড়া জানা মেয়ের ভাল পাত্র জোটে, বিবাহে খরচ কম লাগে, বিবাহের সময় যে মোটা টাকা লাগিবেই, সেটা মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে অল্পে অল্পে খরচ করিয়া গেলে দোষ কি?

মোহনকে জামাই করার সময় বোধ হয় ভদ্রলোকের ভুল ভাঙ্গিয়াছে।

মোটা টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে, লাবণ্যের মার গায়ে একখানা গয়নাও অবশিষ্ট নাই, দু'হাতে শুধু দু'টি সোণা বাঁধানো শাঁখা!

তবে একথাও সত্য যে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখাইলে মোহনকে জামাই করার ভাগ্য তার হইত না।

মোহনের বাপের জন্য লাবণ্যের কলেজে পড়া বন্ধ হইয়াছিল, পিছনে তায় ছিল মার। এ বিষয়ে ছেলের সঙ্গে সে আপোষ করে নাই। কলেজে পড়া মেয়ে আনিয়াছে তাই যথেষ্ট—এবার তাকে অন্তপুরে বৌ হইয়াই থাকিতে হইবে।

মোহন তাকে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ করিতে দেয় নাই—কর্মহীন অলস দিন কাটাইতে লাবণ্যও বই পড়া একটা অবলম্বন করিয়াছে।

মোহন বই কেনে, লাবণ্য পড়ে। ইংরাজী সাহিত্য সে বোধ হয় বেশীই জানে

মোহনের চেয়ে। কখন যে পড়ে, মোহন ভাল বুঝিতে পারে না। নূতন বই নিজের শেষ হওয়ার আগে সে উৎসাহের সঙ্গে তাগিদ দিয়া বলে, 'তাড়াতাড়ি পড়ে নিও, আলোচনা করব—'

লাবণ্য বলে, 'পড়েছি। শেষ বয়সের লেখা বোঝা যায়।'

অন্য সব দিকে লাবণ্য তাকে হতাশ করিয়াছে।

তার খানিকটা ছেলেমানুষী উচ্ছাস, কারণে অকারণে হাসি-কান্নার মধ্যে যার প্রকাশ, বাকীটা পরের মুখ চাওয়া পরাধীনতায় সন্তুষ্ট আড়াল-খোঁজা নিষ্ক্রিয় জড়তা। সময় সময় মনে হয়, ভয় ও সঙ্কোচে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে শ্যাওলা আর পানাভরা পুকুরের মত, মাঝে মাঝে ছেলেমানুষীর বদ্‌বুদ্‌ উঠে, ছোটবড় মাছের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা আত্মচেতনা লেজের ঝাপ্‌টায় একটু সময়ের জন্য পানা সরাইয়া দেয়।

এত বই পড়া, ইংরাজী সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করা তার মনের গড়ন, স্বভাব আর চালচলনে কোন পরিবর্তনই যেন আনিতে পারে না।

ওইটুকু ভরসাই মোহনের আছে। পড়াশোনার প্রভাব চেতনায় পড়িবেই—শুধু পরিবেশের জন্য লাবণ্যের চেতনায় সে প্রভাবটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। পরিবেশ বদল হইলে সেটা নিশ্চয় আত্মপ্রকাশ করিবে।

রওনা হওয়ার কয়েকদিন আগেও মোহন তাই ভাবে, সকলকে দেশের এই বাড়ীতে রাখিয়া শুধু লাবণ্যকে নিয়া গেলেই বোধ হয় ভাল হইত। আত্মীয়-পরিজন আর কেউ অবশ্য যাইবে না, শুধু তার মা আর ভাইবোন। ওদেরও রাখিয়া যাওয়াই হয়তো উচিত ছিল। কেবল সে আর লাবণ্য, আর কেউ নয়। একা থাকিলে নিজেকে হয়তো লাবণ্য খুঁজিয়া পাইত। কে কি মনে করিবে সর্বদা ভাবিতে না হওয়ায় সে নিজের কথা ভাবিবার অবসর পাইত।

কিন্তু তার নিজের বড় মন কেমন করিবে মা আর ভাইবোনদের জন্য! ওদের রাখিয়া বৌ নিয়া কলিকাতায় বাস করিলে লোকে নিন্দাও করিবে।

গ্রামের দু'জন মানুষ মরিয়ার মত মনোমোহনকে ধরিয়া বসিল, যে তারাও তার সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে।

পীতাম্বর এবং শ্রীপতি কামার।

সারাদিন শ্রীপতি হাপর চালায়, দা কুড়াল কাস্তে শাবল লাঙ্গলের ফলা এই সব টুকিটাকি লোহার জিনিষ গড়ে, কোন রকমে তার দিন চলিয়া যায়। খুব কষ্টেই চলে, তবু সে বেকার নয়। তাই মোহন আশ্চর্য্য হইয়া বলে, 'তুই কলকাতা গিয়ে করবি কি?'

'আজ্ঞে, পয়সা কামাব। এমন করে কদিন চলে? খেটে খেটে দেহ ক্ষয়ে গেল, দু'টো পয়সা জোটে না। লোহার দাম চড়ে, দা-কুড়ালের দাম চড়ালে কেউ কিনবে না। বাপটার মরণ ছিল না, ব্যবসা শিখিয়ে গেছে।'

শ্রীপতির বাপ অনেককাল মরিয়া গিয়াছে।

'পয়সা কামাবি কি করে?'

'কারখানায় খাটব। হেথায় হাতুড়ি পিটি, সেথায় পিটাব! মজুরি তো মিলবে! দা' গড়ে ঘরে ঘরে সাধতে হবে না, হাটে গিয়ে হা-পিত্যেস করে খদ্দেরের পথ চেয়ে থাকতে হবে না! আমারে নেন্ কর্তা সাথে।'

বলিতে বলিতে সটান উপুড় হইয়া মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া দু'হাতে সে মোহনের পা জড়াইয়া ধরিল।

'পা ছাড় শ্রীপতি। আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললি তো তুই আমাকে।'

শ্রীপতি কিছুতে পা ছাড়িবে না।

'ফেসাদ করব না কর্তা। দায় ঘাড়ে চাপাব তেমন মানুষ নই। কিছু না করতে পারি, ফিরে আসব।'

অগত্যা মোহনকে রাজী হইতে হইল।

পীতাম্বর আসিল একদিন একটু বেশী রাত্রে—চুপি চুপি চোরের মত আসিল। গ্রামের পথে তখন লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কর্মচারী দু'জনকে ছুটি

দিয়া মোহন বাহিরের ঘরে হিসাবপত্র দেখিতেছিল, চোখ তুলিয়া ভাখে নিঃশব্দে ছায়ার মত কখন পীতাম্বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পীতাম্বর ভূমিকা করিল অনেক। বলিল, 'ওদের কথা শুনো না বাবা, আমি তোমার হিতৈষী। ওরা মিথ্যে করে রটায় আমি তোমার পূর্বপুরুষের নিন্দে করি। আমার দরকার নিন্দে করে? তিনপুরুষ আগে কি ঘটেছে না ঘটেছে, সত্যি না মিথ্যে ঠিক নেই, তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়? দশজনের কাছে আমি তোমার প্রশংসা করি, তোমার ভালই চাই বাবা। কেন ভাল চাইব না? সংসারে কটা মানুষ মেলে তোমার মত?—'

তারপর বলিল, 'একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি তোমার কাছে, মুখ ফুটে বলতে ভরসা পাচ্ছি না বাব।'

'বলুন না, আমার সাধ্য থাকলে করব।'

'আমায় তুমি সঙ্গে নিয়ে চল।'

'আপনি কলকাতা যেতে চান?'

'হ্যাঁ বাবা, নিয়ে চল আমাকে।'

পীতাম্বরের মুখের অসহায় দীন ভাবে এখন আর একটুও অভিনয়ের ছাপ থাকে না, ব্যাকুলতার মধ্যে তার সরলতা স্পষ্ট হইয়া উঠে, সে বলে, 'শোন বলি তোমাকে, তিন দিন হাতে একটি পয়সা নেই, ঘরে এক মুঠো চাল নেই।'

'কলকাতা গিয়ে করবেন কি?'

'পয়সা কামাব। একটা দু'টো মাস একটু মাথা গুঁজে থাকতে দিও, একটা উপায় করে নেব। সহরের পথে পয়সা ছড়ানো থাকে। কাজকম্মো না পাই, ভিক্ষে করব। গাঁয়ে আমার ভিক্ষে করার পর্য্যন্ত উপায় নেই।'

উদ্দেশ্য দু'জনেরি ভাল। অবস্থার উন্নতি করিতে চায়। মোহন রাজী হইয়া গেল। এরা সঙ্গে গেলে বিশেষ ক্ষতিও নাই, অসুবিধাও নাই। এরা আত্মীয়স্বজন নয়।

বাড়ীর পিছন দিকে ঠাকুর চাকরের ঘরের পাশে একটা ছোট বাড়তি ঘর

আছে, দুজনে সেখানে থাকিতে পারিবে। উপার্জনের ব্যবস্থা যদি করিতে না পারে, দু'তিন মাস দেখিয়া গ্রামে বিদায় করিয়া দিলেই চলিবে!

রওনা হওয়ার আগের দিন অনেক রাত্রে গ্রামের লোকের চোখ এড়াইয়া পীতাম্বর আবার আসিল।

'একসাথে যাওয়া হল না বাবা। আমার অদেষ্টটাই মন্দ। পাঁচুর জ্বর এসেছে। পর্শু যাব।'

'পর্শু যদি জ্বর না কমে?

'কমবে,—কালকেই ছেড়ে যাবে। গাড়ীর ভাড়াটা বরং দিয়ে দাও আমাকে আজ, পর্শু টিকিট কেটে রওনা হয়ে যাব।'

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মোহন এবার মনে মনে হাসিল।

গ্রামের লোকের চোখের সামনে মোহনের সঙ্গে সে ট্রেনে উঠিতে চায় না, সকলে টের পাইয়া যাইবে মোহন তাকে দয়া করিয়া নিয়া যাইতেছে। মোহনের কাছে মাসে পাঁচটা করিয়া টাকা নেওয়া চলে, সেটাকা পূর্বপুরুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মোহনের দেয়, দেখা হইলে দশজনের সামনে তার সঙ্গে ভদ্রতা রাখিয়া কথাও বলা চলে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দয়া তো গ্রহণ করা চলে না, ভাব তো করা চলে না তার সঙ্গে—এত গালাগালি ও অভিশাপ দিবার পর!

লোকে ভাবিবে পীতাম্বরের এতটুকু তেজ নাই।

রওনা হওয়ার দিন পাশের গাঁয়ে ছিল হাট।

বোঝাই গরুর গাড়ী আর মানুষ হাটের দিকে চলিতেছে, সকলে জমিলে তবে হাট জমিবে। ছ'দিন হাটের আটচালাগুলি আর চারিপাশের জায়গা খালি পড়িয়া থাকে, প্রতি বুধবার সেখানে মানুষের ভিড় জমে। বাহির হইতে মানুষের ভিড় বড় এলোমেলো মনে হয়, যে যেখানে পারে বেসাতি নিয়া বসিয়াছে, যে যেদিকে পারে চলিতেছে, কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু ভিতরে গেলে

দেখা যায় দোকান-পাটের মধ্যে চলিবার পথ আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ছোট বড় আঁকা-বাঁকা বিভিন্নমুখী অনেক পথ।

বেচিবার জন্য বেসাতি নিয়া বসিবার স্থানও সকলের বহুকাল ধরিয়া সুনির্দিষ্ট হইয়া আছে।

সকলে তাদের গাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যায়। মোহন ভাবে, সপ্তাহে এরা একদিন হাটে যায়, আবার বাড়ী ফিরিয়া আসে। রাত্রি বাড়িতে বাড়িতে একসময় হাট জনশূন্য হইয়া যায়। কলিকাতার হাটে বোমা পড়িতে থাকিলেও এবং বহু লোক পালাইয়া গেলেও টের পাওয়া যায় না হাটের ভিড়ের চাপ একটু কম হইয়াছে। সহরের হাট ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া গিয়াছে, এমনিভাবে সহরের মানুষের সেখানে সকলে শিকড় গাড়িয়াছে।

ট্রেণে মোহন একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করিয়াছিল। চিন্ময় ষ্টেশনে আসিতে পারে। রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা হইতে ছাড়া মান বজায় রাখিয়া তার সামনে নামা যায় না।

মা ম্লানমুখে এক কোণে বসিয়া থাকেন। লাবণ্য আর নলিনী পাশাপাশি বসিয়া মুখ দিয়া কথা বলে আর চোখ দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে থাকে। খুকী এ জানালা ও জানালা করিয়া বেড়ায়। মার কাছে বসিয়া খোকা জানালার কলকব্জা পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকে।

নগেন অনেকক্ষণ হইতে উসখুস করিতেছিল, একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে সে হঠাৎ নামিয়া গেল।

'গাড়ী ছেড়ে দেবে নগেন।'

'পাশের কামরায় উঠছি। পরের ষ্টেশনে আসব।'

মা ও দাদার সামনে অনেকক্ষণ সে সিগারেট টানিতে পারে নাই। নতুন সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে, নেশা বড় প্রবল। কলিকাতায় একেবারে বাড়ীতে পৌঁছানোর আগে নির্জ্জনে সিগারেটে টান দেওয়ার সুযোগ জুটিবে না ভাবিয়া সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে যে সিগারেট খায় কেউ জানে না, হঠাৎ পাশের

কামরায় যাওয়ার কারণটা কেউ অনুমান করিতে পারিবে না। পাগলামি মনে করিয়া বড় জোর একটু বিরক্ত হইবে।

মোহন জোরে ধমক দিয়া বলিল, 'উঠে আয় নগেন, শীগগির আয়। গাড়ী ছাড়ল।'

নগেন মুখ ভার করিয়া উঠিয়া আসিল।

'সিগারেট খাবি তো? এখানে বসে খা। খাচ্ছিস যখন, এত লুকোচুরি কিসের?'

নগেন বিবর্ণমুখে বসিয়া থাকে। মোহন পকেট হইতে সিগারেট কেস বাহির করিয়া একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর নিজে একটা সিগারেট ধরাইয়া কেসটা আবার পকেটে রাখিয়া দেয়।

কলেজে ঢুকিয়াই এত অল্প বয়সে সিগারেট খাইতে শেখা নগেনের উচিত হয় নাই, তবে শিখিয়াছে যখন চোরের মত ভয়ে ভয়ে আড়ালে না খাইয়া সামনেই খাক। নিজেই তাকে একটা সিগারেট দিয়া মোহন তার লজ্জাভয় ভাঙ্গিয়া দিবে ভাবিয়াছিল!

দেওয়ার সময় হাত আগাইল না।

শুধু তাই নয়, মার সামনে নিজেও সে আজ পর্যন্ত কোনদিন সিগারেট টানে নাই, নিজেরও তার এখন দারুণ অস্বস্তি বোধ হইতে থাকে। সামনে ধূমপান করিলে গুরুজনের অমর্যদা হয়, এ শুধু অর্থহীন গেঁয়ো সংস্কার, তবু মা'র দিকে খানিকটা পিছন ফিরিয়া না বসিয়া সে পারে না, কয়েকবার টান দিয়াই সিগারেটটা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। নিজেকে এই বলিয়া বুঝায় যে, মা তো এখনো তার যুক্তিতর্কের খোঁজ রাখে না, মা হয়তো মনে করিবে ছেলে তাকে অবজ্ঞা করিতেছে। মিছামিছি মার মনে কষ্ট দিয়া লাভ কি? কথাটা আগে মাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তারপর সামনে যত খুসী চুরুট সিগারেট টানিলেই হইবে।

'আর খাব না দাদা!'

মাথা নীচু করিয়া নগেন বসিয়া আছে ধরা-পড়া চোরের মত। সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দেওয়াকে নগেন তবে ক্রুদ্ধ দাদার ভর্ৎসনা মনে করিয়া লজ্জায় অনুতাপে কাবু হইয়া পড়িয়াছে!

তাই স্বাভাবিক বটে!

এতক্ষণ সে ভুলিয়াই গিয়াছিল, যাত্রা আরম্ভ করা মাত্র পারিবারিক জীবনটা তার নূতন রীতিনীতিতে চলিতে আরম্ভ করে নাই, সকলের চেতনা নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ভাই-এর সঙ্গে তার সম্পর্কটা এতকাল যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। মার মত ওকেও বুঝাইয়া পড়াইয়া না নিলে তার কথা ও কাজের ভুল মানে বুঝিবার সম্ভাবনা পদে পদে রহিয়া গিয়াছে। কেবল ওদের দু'জনকে নয়, সকলকে বুঝাইতে হইবে। সকলের চিন্তাধারাকেই তার নতুন পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। নতুবা সে কি ভাবিয়া কি বলে আর করে, ওরা বুঝিতে পারিবে না।

চিন্তাটা তাকে পীড়ন করে। মনে হয়, নূতন একটা ষ্টেজে অভিনয় করার জন্য সকলকে সে যেন নিয়া চলিয়াছে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয় করিতে শেখানোর ভারটাও তার!

চিন্ময় ষ্টেশনে আসে নাই। ষ্টেশনের কুলীরাই তাদের প্রথম অভ্যর্থনা জানায়।

লাবণ্য মুখ বাঁকাইয়া বলে, 'বন্ধু! তোমার সহুরে বন্ধু!'

অনেকদিন আগে চিঠিতে চিন্ময় তাকে ইঙ্গিতে গেঁয়ো বলিয়াছিল, বলিয়াছিল তাকে প্রশংসা করিবার জন্যই, কিন্তু লাবণ্য করিয়াছিল রাগ। লাবণ্য কি এখনো তাহা ভোলে নাই?

চিন্ময় ষ্টেশনে আসিবে বলে নাই, মোহনও তাকে ষ্টেসনে হাজির থাকিতে লেখে নাই। কবে কোন ট্রেণে কখন তারা পৌছিবে শুধু এই খবরটা তাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই মোহন প্রত্যাশা করিতেছিল সে নিশ্চয়ই সাগ্রহে তাদের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবে।

গ্রামের কত লোক তাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে সঙ্গে আসিয়াছিল, অনেকের চোখ সে ছল ছল করিতে দেখিয়াছে।

এখানে তার বন্ধু আছে মোটে একজন, সেও তাকে নামাইয়া নিতে ষ্টেসনে আসিল না?

চিন্ময় ইয়োরোপ আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছে, কাজের জন্য আপিসের পয়সায় তাকে যখন তখন বোম্বে মাদ্রাজ ছুটিতে হয়। সকালে ট্রেণে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় নামা হয়তো তার কাছে কতকটা ট্রামে বাসে ওঠা নামার মত। তবু রাগ হয়, তবু মনে হয় তার আসা উচিত ছিল।

বাড়ী পৌছিতে রাত প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল। আধঘন্টা পরে আসিল চিন্ময়ের ভাই মৃন্ময়।

চিন্ময় কাল হঠাৎ পাটনা চলিয়া গিয়াছে, তাদের দেখা-শোনা করার ভার সে দিয়া গিয়াছে মৃন্ময়কে। কখন তারা পৌছিবে চিন্ময় কিছু বলিয়া যায় নাই, তারও জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতে খেয়াল ছিল না, বিকাল হইতে এবাড়ী ওবাড়ী করিতে করিতে বেচারা একেবারে হয়রাণ হইয়া গিয়াছে।

'আমি গিয়ে আপনাদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

নগেনের সমবয়সী ছেলে, ছিপছিপে রোগা চেহারা, খুব লাজুক। চোখ তুলিয়া কারও চোখের দিকে চাহিতে পারে না। সে যেন লাজুক মেয়ে, মোহন যেন তার নূতন বর, লজ্জা ভয়ে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছে।

অনেকদিন মোহন তাকে দেখে নাই, একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিছুদিন আগে কলিকাতা আসিয়া সে দু'রাত্রি ওদের বাড়ী খাইয়াছে, মৃন্ময় হয়তো বাড়ীতেই ছিল কিন্তু সামনে না আসিয়া আড়ালে লুকাইয়া ছিল। ছেলেটার পক্ষে তাও অসম্ভব মনে হয় না!

মোহন মমতার সঙ্গে বলিল 'টাইম টেবল দেখলেই জানতে পারতে কখন পৌছব।'

'টাইম টেবল? ভুলে গেছি।'

'একটা চাকরকে এ বাড়ীতে বসিয়ে রাখলেও পারতে। বার বার তোমাকে খোঁজ নিতে আসতে হত না।'

'চাকর? খেয়াল হয়নি তো!'

মৃন্ময় লজ্জার সঙ্গে অপরাধীর মত একটু হাসিল:—'আমি যাই, খাবারটা পাঠিয়ে দিই। আর যদি কোন দরকার থাকে—?'

পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে!

স্নেহ করার অধিকার যাদের আছে তাদের সঙ্গ তাকে পীড়ন করে। স্নেহের স্বরে কেউ কথা বলিলে তার ভিতরটা কেমন অস্থির অস্থির করিতে থাকে, মাথা গুলাইয়া যায়। এই অবস্থায় তার কথায় একটু তোতলামির ভাব দেখা দেয়, একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মুহূর্ত্তের জন্য পরের শব্দটি বুঝি কোথায় হারাইয়া যায়, জিভ দিয়া হাতড়াইয়া খুঁজিয়া আনিতে হয়।

মোটামুটিভাবে জিনিষপত্র একটু গুছাইয়া সকলের শোয়ার ব্যবস্থা করিয়া বেশী রাত্রে মোহন নিজে যখন শুইতে গেল, মৃন্ময়ের রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে যন্ত্রণার ছাপটা তখনো তার মনে আছে।

পরিশ্রমে নয়, সহর যাত্রার উত্তেজনায় সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শোয়া মাত্র তারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—মোহনের ঘুম আসিতে একটু দেরী হয়। মৃন্ময়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে নগেনের কথা চিন্তা করে। হোষ্টেলে থাকিয়া নগেন মফঃস্বলের কলেজে পড়িতেছিল, দেশের বাড়ী হইতে তিন চার ঘণ্টার পথ। এবার তাকে কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তি না করিয়া যেখানে ছিল সেখানে রাখিলে কেমন হয়? উঠতি বয়সে মফঃস্বলের সহরের অবাধ আলোবাতাস আর খোলা মাঠ ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখে, শান্ত আবেষ্টনী মনকে সুস্থ রাখে। কিন্তু কেউ বোধ হয় এ প্রস্তাবে রাজী হইবে না। নিজে সে পচা-ডোবা বনজঙ্গল কাদা আর মশাভরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এখানে বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়ায় সুবিধা থাকিতে নগেনকে দূরে হোষ্টেলে গিয়া থাকিতে বলিবে কোন মুখে?

নগেনের ভালর জন্যই সে যে তাকে ওখানে রাখিয়া পড়াইতে চায়, তার এ যুক্তির মানেও কেহ বুঝিবে না। বিশেষতঃ মা।

পরদিন সকালে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আসিল। বলিল, 'আমি আপনার বাড়ীওয়ালা। পরিচয় করতে এলাম।'

মোহন একটু অভিভূত হইয়া বলিল, 'আসুন! বসুন।'

কোথায় সে যেন এইরকম একটি মূর্তিমান আভিজাত্যের মত জমকালো চেহারার মানুষ দেখিয়াছে। মনের মধ্যে গভীর ভয় ও শ্রদ্ধায় আজও সেই মানুষটা জড়াইয়া আছে, তার স্মৃতিটা পরিণত হইয়া গিয়াছে অনুভূতিতে। কে সে? কবে কোথায় সে তাকে দেখিয়াছিল?

জগদানন্দ বসিল।

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বলিল, 'পরিচয় করার এত আগ্রহ কেন বলি। বাড়ীটার ভাড়াটে জুটছিল না। এরকম বাড়ী পছন্দ করার মত টেস্ট যাদের আছে, আর এত টাকা ভাড়া যারা দিতে পারে, তারা নিজেরাই বাড়ী তৈরী করে বাস করে। তাই একটু কৌতূহল হচ্ছিল, বাড়ীটা যিনি পছন্দ করে ভাড়া নিলেন, তিনি মানুষটা কেমন দেখে যাই।'

ধীর স্পষ্ট কথা, বেশ বুঝা যায় বক্তব্যকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই তার অভ্যাস। মোহন জানে, এভাবে যারা কথা বলে তারা ধৈর্য্যশীল শান্ত প্রকৃতির মানুষ হয়।

'বেশ বাড়ীটি আপনার। সকলের পছন্দ হয়েছে।'

জগদানন্দ জিজ্ঞাসা করে, 'জমি কেনা আছে নিশ্চয়?'

মোহন হাসিল।—'না। তবে কিনবার ইচ্ছা আছে।'

জগদানন্দ হাসিমুখে মাথা হেলাইয়া সায় দিল, 'তাহলে বছর খানেক থাকবেন আশা করা যায়।'

ধীরে ধীরে দু'জনের আলাপ চলিতে থাকে। পরিচয় গড়িয়া উঠিতে থাকে

অত্যন্ত মন্থরগতিতে কিন্তু দৃঢ়ভাবে। একজন আরেকজনকে যতটুকু জানিতে পারে তার মধ্যে ফাঁকি থাকে না। মোহনের ভালই লাগে। তার অনেক কাজ ছিল, সেগুলি স্থগিত রাখিতে হইলেও মনে হয় না বাজে গল্পে সময় নষ্ট হইতেছে।

মোহনের কলিকাতায় বাস করিতে আসাকে সমর্থন করিয়া জগদানন্দ বলে, 'বেশ করেছেন। এসব ইচ্ছাকে হাঙ্গামা বা অসুবিধার ভয়ে দমন করতে নেই। গ্রামে থাকতে ভাল না লাগলে গ্রামে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। তখন সহরে আসাই ভাল।'

'গ্রামের ক্ষতি হয়।'

'কেন? আপনি চলে আসাতে গ্রামের কি ক্ষতি হয়েছে? লোকে বলে শুনতে পাই শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসে বলে গ্রামের আরও অবনতি হয়। আমি তার মানে বুঝতে পারি না ভাই। শিক্ষিত আর ধনীরা গ্রামে থেকে গ্রামের এতটুকু উন্নতি করে? কোন দেশে করেছে? শিক্ষিতেরা বেকার বসে থাকে, ধনীরা টাকা খরচ করতে না পেরে টাকা আটকে রাখে। ওরা সহরে এলেই বরং দেশের উপকার বেশী। সহরের উন্নতির জন্য ওদের দরকার। সহরের উন্নতি না হলে গ্রামের কখনো উন্নতি হয়?'

বক্তব্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার, কিন্তু মোহন বুঝিতে পারে না। তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া জগদানন্দ বলে, 'সহর মানে বড় বড় বাড়ী, ট্রাম বাস লোকের ভিড় নয়। শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে প্রতিভাবান মানুষেরা যেখানে একত্র থাকে, সেটাই হল সহর। এদের দল যত বাড়ে ততই ভাল। শিক্ষিত আর ধনীরা সহরে না এলে এদের দল বাড়বে কি করে?'

এতক্ষণ পরে মোহন মনে মনে একটু রাগিয়া যায়। সে কি ছাত্র যে লোকটা বাড়ী আসিয়া তাকে পড়া বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে? মানুষের এসব ব্যক্তিগত উদ্ভট ধারণা চিরদিন তাকে পীড়ন করে।

'আমি তিনখানা বই লিখেছি: ভারতবর্ষ ও সাম্যবাদ, ভারতের সংস্কার আন্দোলনের রূপ, আর বাঙলায় শিল্পোন্নতির পথ। পড়েছেন?'

'না। নামও শুনিনি।'

জবাব শুনিয়া জগদানন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। বলিল, 'একেবারেই কাটছে না বই ক'টা। দাম বেশী করিনি, প্রত্যেক কপিতে চার আনা করে খরচ বেশী পড়েছে। তবু কেউ কিনতে চায় না। এমনি দিয়ে দিয়েই লোককে পড়াই। আপনাকেও দেব, পড়ে দেখবেন।' জগদানন্দ হাসিল, 'তিনখানা বই কেউ পড়তে চায় না, তবু আরেকটা লিখতে আরম্ভ করেছি—মানুষের ভবিষ্যৎ। চিন্তাগুলি লিখে তো রাখি, কেউ পড়ে তো পড়বে। সত্য বলে যা জানা যায় সকলকে শোনাবার অধিকার প্রত্যেকের আছে, কি বলেন?'

'প্রত্যেকে যদি শোনায়, শুনবে কে?'

'সকলে শুনবে। যে নিজের কথা শোনায় অন্যের কথা শুনতে তো তার বাধা নেই। তা ছাড়া, সত্যের সন্ধান কটা লোকে পায়? আমার নিজের ধারণা সত্য, এ বিশ্বাস কটা লোকের আছে?'

মোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। মানুষটা জানিয়া শুনিয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছে না সরলভাবে মনের কথা বলিতেছে ঠিক বুঝিতে পারে না।

আলোচনা তাদের এবার অন্য দিকে গড়াইত অথবা আপনা হইতে থামিয়া যাইত বলা যায় না, একটা বাধা পড়িল। হাত কাটা ফর্সা সার্ট গায়ে নতুন বাড়ীর নতুন চাকর জ্যোতি খবর দিল, মা ডাকিতেছেন।

মা ঠিক দরজার আড়ালেই ছিলেন, উৎসুক উত্তেজিতা মা।

'উনি কে?'

মার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মোহন বলিল, 'উনি আমাদের বাড়ীওয়ালা জগৎবাবু।'

'জগৎ কি?'

'জগদানন্দ ভটচাজ বোধ হয়।'

'জিজ্ঞেস করে আয় তো উনি শ্রীশ্রীপরমানন্দ ঠাকুরের ভাই নাকি?'

জিজ্ঞাসা করিয়া মোহনকে আর জবাবটা মাকে বলিয়া আসিতে হইল না, জগদানন্দ তার প্রশ্নের জবাব দেওয়ামাত্র মা নিজেই ঘরের মধ্যে আসিলেন। গলায় আঁচল দিয়া পায়ের জুতায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, জুতার ঠিক উপরে পায়ে আঙুল বুলাইয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিলেন, জিভে ঠেকাইলেন।

'আপনার দাদা আমাদের গুরুদেব ছিলেন।'

জগদানন্দ বিব্রতভাবে বলিল, 'তা হবে, তা হবে। আমাকে আবার প্রণাম করা কেন।'

মার মুখের ভাব দেখিয়া মোহন বুঝিতে পারিল মা ভাবিতেছেন, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার, বয়সে তিনি বড় বলিয়া গুরুদেবের ভাই তাঁর প্রণাম গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন!

'আপনাদের বংশের ছোট ছেলেটিও আমার নমস্য। আপনাদের পায়ের ধূলো ছাড়া তো আমাদের গতি নেই। অনেক জন্মের পুণ্য ছিল, না ডাকতে নিজে বাড়ীতে পা দিয়েছেন। এ বেলা আপনাকে খেয়ে যেতে হবে, আমি প্রসাদ পাব।'

'এ বেলা? এ বেলা তো হয় না। খাওয়ার জন্য কি, কাছেই তো আছি, আরেকদিন খেয়ে যাব।'

'তবে দু'টি ফল কেটে আনি?'

মোহন স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। তার মা গুরুদেবের ভাইকে প্রণাম করিতেছে, পুণ্যের জন্য পাতের প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছে! ভাগ্যে আজ চিন্ময় আসে নাই, এসব দেখিয়া শুনিয়া না জানি সে কি ভাবিত!

'ফল কেন, খাবার আর চা পাঠিয়ে দেবে যাও।'

ছেলের রুক্ষ গলার আওয়াজে মা দমিয়া গেলেন। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন ভিতরে।

এখন পরমানন্দের কথা মোহনের মনে পড়িয়াছে। জগদানন্দের ব্রাশ করা চুল, পালিশ করা জুতা, জমকালো পোষাক বাধা না দিলে আগেই মনে পড়িত।

মা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন। গুরুদেবের মূর্ত্তি তাঁকে ধ্যান করিতে হয়, মোহনের মত তাঁর মনে পরমানন্দের চেহারা ঝাপসা হইয়া যাইতে পারে নাই। কয়েকবার নিজেদের বাড়ীতেই সে পরমানন্দকে দেখিয়াছে, শেষবার আট দশ বছর আগে। সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে ব্যাঘ্র চর্ম্মের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া থাকিতেন, বাড়ীতে সকলে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিত, ফিস ফিস করিয়া কথা বলিত, শিশু কাঁদিয়া উঠিলে তার মা তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিত।

শেষদিন তিনি মোহনকে কাছে বসাইয়া একঘণ্টা ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দিয়াছিলেন,—সকলের সামনে।

কত বয়স ছিল তখন মোহনের? কুড়ি একুশের বেশী নয়। সে অভিজ্ঞতা মোহন জীবনে ভুলিবে না। সকলের সামনে পরমানন্দ যেন তাকে উলঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তার মনের গোপন স্মৃতি স্বপ্ন মেলিয়া ধরিয়াছেন সকলের কাছে, দুঃশাসনের চেয়ে তিনি নিষ্ঠুর।

'আমারও আপনাকে চেনা মনে হচ্ছিল। একটা আশ্চর্য্য যোগাযোগ ঘটেছে।'

'বেশী আর আশ্চর্য্য কি? দাদার কুড়ি বাইশ হাজার শিষ্য ছিল। আমাদের দু'ভায়ের চেহারারও অনেক মিল ছিল।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া একটু মুখ বাঁকাইয়া সে কাপটা নামাইয়া রাখে। মোহন বিরক্ত হইয়া ভাবে, মার সঙ্গে আর পারা গেল না। দামী চায়ের সেট কিনিয়া দিয়াছে, লিকার দুধ চিনি কোথায় ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পাঠাইয়া দিবে, একেবারে কাপে চা তৈরী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। এ যেন গ্রামের চা-পিপাসু হালদার আসিয়াছে, খানিকটা গরম সরবৎ করিয়া দিলেই তার তৃপ্তি হইবে।

আবার জ্যোতি আসে। এবার লাবণ্য ডাকিতেছে।

'মা গিয়ে প্রণাম করতে বললেন।' লাবণ্য বলে একটু ভয়ে ভয়ে, বিব্রতভাবে।

'প্রণাম নয়, নমস্কার করবে। চলো পরিচয় করিয়ে দিই।' মোহন জোর দিয়া বলে।

মা যা খুসী করুন, তাঁর অজুহাত আছে, তিনি সেকেলে মানুষ। শ্বশুর শাশুড়ীর গুরুদেবের ভাই বলিয়াই একটা মানুষের কাছে স্ত্রীকে ভক্তিতে গদগদ হইয়া উঠিতে দেওয়া যায় না।

স্বামীর নির্দেশ মত অভিনয় করিয়া লাবণ্য সবে বসিয়াছে, মা আসিলেন।

'প্রণাম করেছ বৌমা?'

জগদানন্দ বলে, 'থাক থাক, প্রণাম দরকার নেই।'

লাবণ্য কাঠের পুতুলের মত বসিয়া থাকে। একবার সে যেন প্রণাম করার জন্য উঠিবার চেষ্টা করে, মোহনের দৃষ্টিপাতে সাহস পায় না। ছেলের রুক্ষ গলার কথা মা সহ্য করিয়াছিলেন, বৌ-এর এ অবাধ্যতা তাঁর সহ্য হয় না।

'সাধে কি তোমার এ অবস্থা হয়েছে বাছা? পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, আজও পেটে ছেলে ধরতে পারলে না, শুয়ে শুয়ে ব্যথায় কাতরাও। আমরা হলে বিষের অহঙ্কারে ফেটে না পড়ে গলায় দড়ি দিতাম।'

চার

পীতাম্বর বলিয়াছিল সে দুদিন পরে রওনা হইবে।

সাতদিন পরেও সে না আসায় মোহন যখন ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকাতা আসিবার কথাটা তার ফাঁকি, ভাওতা দিয়া গাড়ী ভাড়া আর সংসার খরচ বাবদ কিছু টাকা আদায় করাই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, পীতাম্বরের খবর পাওয়া গেল। বিনা টিকিটে কলিকাতা আসিবার চেষ্টা করিতে গিয়া কয়েকদিনের জন্য হাজতে যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

হইয়াছে জরিমানা, সে টাকা না দিতে পারিলে অগত্যা হাজতবাস।

পীতাম্বর ভাবিতেও পারে নাই টিকিট না করার জন্য কাউকে রেল কোম্পানী

আবার জেলে পাঠানোর হাঙ্গামা করিতে পারে। বড় জোর টানিয়া নামাইয়া দেয়, তার বেশী কিছু নয়। গাড়ী তো কলিকাতায় যাইবেই, জায়গারও কোন অভাব নাই গাড়ীতে, একটা মানুষ বিনা টিকিটে উঠিলে কি এমন আসিয়া যায় কোম্পানীর ? রাখাল সরকার কতবার ওভাবে কেতনপুর যাতায়াত করিয়াছে।

মোহন গিয়া তাকে ছাড়াইয়া আনিবার পর এই আপসোসটাই তার বড় দেখা গেল যে অন্য সকলে দিব্যি বিনা ভাড়ায় ট্রেনে চাপিয়া বেড়ায়, জীবনে একটিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া যায় কেবল সে। অদৃষ্টে কি যেন একটা প্যাঁচ আছে তার। দেবতাদের রাগ আছে তার উপর।

সব কিছুই তার ভাগ্যে মন্দ দাঁড়াইয়া যায়।

'যে আমায় ধরল, সে লোকটা মন্দ নয়। বললে অন্য সময় হলে ছেড়ে দিত, হঠাৎ কদিন থেকে খুব কড়াকড়ি চলছে। মাঝে মাঝে নাকি দু'চারদিন এমনি কড়া ব্যবস্থা চলে, তারপর আবার ঢিল পড়ে যায়। তা, কপাল যদি আমার মন্দ না হবে বাবা, আমি যখন আসব ঠিক সেই সময়টা ওদেরও জবরদস্তির সময় হয় ?'

হাঙ্গামা করিতে হওয়ায় মোহন বিরক্ত হইয়াই ছিল, এবার রাগ করিয়া বলে, 'ভাড়া দিয়ে এলাম, বিনা টিকিটে আসবার আপনার কি দরকার ছিল ? যখন ধরল, তাড়াতাড়ি টিকিট কাটতে পারেন নি বলে ডবল ভাড়া দিয়ে দিলেন না কেন ?'

পীতাম্বর লজ্জিতভাবে বলে, 'ভাড়া কই বাবা ? সাত গণ্ডা পয়সা সম্বল করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।'

মোহন চুপ করিয়া থাকে।

'মেয়েটাকে আনালাম। এক বছর আনাতে পারি নি। প্রথম পোয়াতি মেয়ে, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে, গিন্নি কেঁদে কেটে অস্থির। গাড়ী ভাড়ার টাকাটাও রেখে এলাম, এটা ওটা খাওয়াতে পারবে মেয়েকে। নইলে বাঁচবে না মেয়েটা।'

মোহন ভাবে, গরীবের কি আর অজুহাতের অভাব হয়। টাকাটা যে তাকে দেওয়া হইয়াছিল গাড়ী ভাড়া বাবদ, অন্যভাবে ও টাকা যে খরচ করা চলে না, এ যুক্তি পীতাম্বর বুঝিবে না।

শ্রীপতিকে জ্যোতির ঘরে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, পাশের ছোট ঘরটি দরকার হইয়াছে মার। পীতাম্বরকে কোথায় থাকিতে দেওয়া যায় মোহন মনে মনে তাই ভাবিতেছিল। গ্যারেজের সঙ্গে ছোট একটি বাড়তি ঘর ছিল, খুঁজিয়া পাতিয়া পীতাম্বর নিজেই সেখানে থাকিবে স্থির করিয়া ফেলিল। ঘর না বলিয়া খোপ বলাই ভাল, মাঝখানে শুইয়া দু'হাত বাড়াইয়া দু'দিকের দেয়াল ছোঁয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে থাকিবার কথা বলিতে গিয়া মোহন চুপ করিয়া গেল। পীতাম্বরের গায়ে সাটিনের গলাবন্ধ ময়লা কোট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, সঙ্গে একটা রঙচটা টিনের তোরঙ্গ আর সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা। তবু সে ভদ্রলোক। বাড়ীতে ওকে নিজেদের মধ্যেও রাখা যায় না, চাকরবাকরের সঙ্গেও থাকিতে দেওয়া চলে না। তার চেয়ে এ ঘরে থাকাই ভাল।

'তোমার আমি এতটুকু অসুবিধে করতে চাই না মোহন। আমি যে আছি তুমি টেরও পাবে না বাবা। যা তুমি করছ বুড়োর জন্যে অন্য কেউ কি করত?'

পীতাম্বর এই খোপটি বাছিয়া নেওয়ার পর তাকে বাড়ির মধ্যে থাকিতে দেওয়ার অসুবিধার কথাটা মোহনের মনে পড়িয়াছিল, আগে নয়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তার মনের ভাব কি দাঁড়াইবে আগেই অনুমান করিয়া পীতাম্বর কি গ্যারেজে থাকা ঠিক করিয়াছে? মানুষটার এতখানি বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের অস্তিত্বে মোহনের যেন কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চায় না।

সহরের জাঁকজমক, তার গৃহ ও গৃহসজ্জা পীতাম্বরকে এতটুকু অভিভূত করতে পারে নাই দেখিয়াও মোহন একটু ক্ষুণ্ণ হয়। এমন নির্ব্বিকার, অবহেলার সঙ্গে সে নূতন পরিবেশকে মানিয়া নিয়াছে যে মনে হয় আরও বিরাট আরও

অভিনব আরও বিস্ময়কর কিছু সে কল্পনা করিয়াছিল, মনের মত না হওয়ায় বরং আশাভঙ্গের ব্যথা পাইয়াছে !

বাড়ীর সকলে মহোৎসাহে চিড়িয়াখানা মিউজিয়ম দেখিতে যায়, পাশ আনিয়া মনুমেণ্টে ওঠে, নগেন প্রায় প্রতিদিন এবং তার সঙ্গে দু'একদিন পরে পরে নলিনী সিনেমা দেখিতে যায়, কোনদিন তাদের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার জন্য পীতাম্বর ভুলিয়াও অনুরোধ জানায় না। দামী একটি গাড়ী আসিয়া মোহনের শূন্য গ্যারেজ পূর্ণ করে, উত্তেজিত আনন্দে সকলে চারিদিকে পাক দিয়া দিয়া গাড়ীর অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে, মোহন পুত্রস্নেহে বনেটে হাত বুলায়,—পীতাম্বর স্মিতভাবে শুধু একটু হাসে, দু'বার মাথা হেলাইয়া মোহনের গাড়ী কেনাকে সমর্থন জানায়, তারপর বিড়ি টানিতে টানিতে নিজের মনে কি যেন ভাবিতে থাকে।

নূতন গাড়ীতে চাপিয়া একদিন সহরে একটু বেড়াইয়া আসার আগ্রহও তার বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। শ্রীপতি সুযোগ আর স্থান পাইলেই জীবন সার্থক করিয়া নেয়, গাড়ী গ্যারেজ হইতে বাহির হইলে পীতাম্বর কখনো সামনে আসিয়া বলে না, চলো বাবা, আমিও একটু ঘুরে আসি।

একদিন মোহন গাড়ীতে একা বাহির হইয়াছে, ভাবিয়াছে পথে গিয়া ঠিক করিবে কোথায় যাওয়া যায়। পীতাম্বরও বাহির হইয়া ফুটপাত ধরিয়া গুটি গুটি হাঁটিয়া চলিতেছিল। দেখিয়া মোহনের বড় মায়া হইল।

তার নতুন গাড়ীতে চাপার সাধটা হয়তো বেচারা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে লজ্জা পায়, হয়তো সে কি মনে করিবে ভাবিয়া সাহস পায় না। নিজে যাচিয়া ওর সাধটা তার মেটানো উচিত।

গাড়ী থামে, ডাক শুনিয়া পীতাম্বর কাছে আসে। মোহন গভীর উদারতার সঙ্গে বলে, 'কোথায় যাচ্ছেন? চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।'

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলে, 'মোটরে চাপতে পারি না বাবা, কেমন গা গুলিয়ে ওঠে।'

তাকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী আগাইয়া যায়, মোহনের মৃদু বিরক্তি ধীরে ধীরে ভোঁতা ক্রোধে পরিণত হইতে থাকে। পীতাম্বরের অজুহাত সে বিশ্বাস করে না। যে গাড়ীতে চোখ বুঝিয়া থাকিলে সব সময় বুঝা যায় না গাড়ীটা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে, তার সেই গাড়ীতে চাপিলে ব্যাটার গা গুলাইবে!

এ শুধু পীতাম্বরের অহঙ্কার। অনুগ্রহ নিতে তার অপমান বোধ হয়।

পীতাম্বরের অনেক চালচলনের মানে এখন যেন মোহনের কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়! তার বাড়ীতে যে থাকিতে হইয়াছে এই লজ্জাতেই পীতাম্বর কাতর, প্রাণপণে সে নিজের সম্মান বাঁচাইয়া চলিবার চেষ্টা করে। গ্যারেজের ঘরটা বাছিয়া নেওয়ার কারণও তাই।

গলাবাজিতে গ্রামকে সে মুখর করিয়া রাখিত, এখানে আসিয়া একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছে। কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না, সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকে, সহানুভূতি চায় না, পরামর্শ চায় না, সুবিধা চায় না। সাত গণ্ডা পয়সা সম্বল করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল, এ পর্যন্ত মোহনের কাছে একটি পয়সাও সাহায্য চায় নাই। সাত আনা কি খরচ হইয়া যায় নাই তার?

গ্রামের লোকের চোখ এড়াইয়া অনেক রাতে গাড়ীভাড়া ভিক্ষা চাহিতে আসার সঙ্গে এ সমস্তের একটা যেন মিল আছে।

এক সন্ন্যাসীর কথা মোহনের মনে পড়ে। ভিক্ষা করিতে দুয়ারে আসিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, বাড়ীর মানুষ তাকে দেখিতে পায় নাই জানিয়াও একটি শব্দ করিত না, কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অন্য বাড়ীর দুয়ারে চলিয়া যাইত। 'কি চাও?—জিজ্ঞাসা করিলেও সে সাড়া দিত না, যেন শুনিতেই পায় নাই। ভিক্ষা সে চাহিতে আসিয়াছে, একমুষ্টি চাল, কিম্বা একটি পয়সা তার প্রার্থনা, তবু কেউ তাকে ভিখারী ভাবিত না!

মোহন ভাবিয়া রাখে, বাড়ী ফিরিয়া আজ পীতাম্বরকে ডাকিয়া একটি টাকা দিবে, সকলের সামনে। না, এক টাকা নয়, চার আনা পয়সা দি বলিবে,

আপনার হাত খরচের জন্য দিলাম। রোজ আপনাকে চার আনা করে দেব। চার আনায় আপনার কুলোবে তো?

শ্রীপতির চাহিতে লজ্জা নাই। চাওয়ারও তার শেষ নাই। সে পয়সা চায়, পুরাণো কাপড় পুরাণো জুতা চায়, পেসাদ চায়, আমোদ চায়, পরামর্শ চায়, কাজ চায়।

তার চেয়েও বেশী চায় দরদ।

কারও অবহেলা সে সহিতে পারে না, কড়া কথায় তার চোখে জল আসিয়া পড়ে। প্রতিধ্বনি ছাড়া যেমন শব্দ মুহূর্ত্তের বেশী বাঁচিতে পারে না, অন্যের মুখে হাসি না ফুটিলে তার মুখের হাসি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। জিনিস তৈরী করা আর সেই জিনিস বিক্রী করার জন্য হন্যে হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানোর একটানা একঘেয়ে জীবন যাপনের পর এতগুলি দিনের অবসর সে বোধ এই প্রথম পাইয়াছে, গম্ভীর নির্ব্বাক মানুষটা অনভ্যস্ত মুক্তির আনন্দে চপল ও মুখর হইয়া উঠিয়াছে, হাতুড়ি ধরার আগে ছেলেবেলা যেমন ছিল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে সে সহরকে দেখে, পূজা করে উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে, অন্তহীন প্রশ্নে। তার ভাব দেখিয়া সকলে হাসে, কিন্তু তার ভাবপ্রবণতা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সকলের বিস্ময়ানুভূতি আবার ধারালো হইয়া উঠে।

কেবল সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গে, দুপুরে যখন অন্য সকলে ঘুমায়, রাত্রে যখন সে নিজে ঘুমাইতে যায়, মুখ দেখিয়াই টের পাওয়া যায় তার মন কেমন করিতেছে। স্তিমিত চোখ, নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া মুখের দুটি প্রান্ত। খাইতে বসিয়া সে নানা ব্যঞ্জনের দিকে তাকায়, ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করে। আসিবার দিন বৌ তাকে কুচো চিংড়ি দিয়া কচুর ঘণ্ট রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। এসব তরকারীর স্বাদ তো সে রকম নয়? বাড়ীর পিছনে জলায় এবার অজস্র কচু হইয়াছে, বৌ হয়তো রোজ কচুঘণ্ট রাঁধিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, নিজে খায়।

মন খারাপ হইলে শ্রীপতি পীতাম্বরের কাছে গিয়া খানিক তফাতে উবু হইয়া

বসে, পীতাম্বর ধরানো বিড়িটা আগাইয়া ধরিলে দু'হাত পাতিয়া জ্বলন্ত বিড়িটা গ্রহণ করে, একটু আড়াল করিয়া বিড়িতে টান দেয়।

'চালটা মেরামত করা হয় নি।'

'হুঁ।'

'বিষ্টি আর তেমন হচ্ছে না এইটুকু ভরসা।

'এখানে হচ্ছে না তো কি? দেশে হয়তো হচ্ছে।'

'তা হয়?'

শ্রীপতি জানে বৃষ্টি যখন হয় পৃথিবীর সব জায়গাতেই হয়। এখানে বৃষ্টি নামে না ওখানে নামে, আকাশ কি ভিন্ন ভিন্ন এখানের এবং ওখানের? দেশের আকাশ ঢাকিয়া যখন কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে, এই সহর কি তখন অন্য একটি পরিষ্কার আকাশের নীচে রোদে ঝলমল করে?

পীতাম্বর বাহিরেই বেশী সময় কাটায়, কিন্তু কোথায় যায় কি করে কারো কাছে প্রকাশ করে না। পীতাম্বর বাড়ীতে থাকিলে, জ্যোতির অবসর থাকিলে, শ্রীপতি জ্যোতির সঙ্গে গল্প করে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স, চুল ছাটার কায়দায় আর হাতকাটা ছিটের সার্টে তাকে খুব স্মার্ট দেখায়।

প্রথমে শ্রীপতি তো ভাবিয়াছিল, সে বুঝি মোহনের কোন আত্মীয়।

জ্যোতির কথা কিন্তু বড় নোংরা। এমনি তাকে দেখিলে মনে হয় শিক্ষিত ভদ্র যুবক বুঝি চাকরের কাজ করিতেছে, তার কথা শুনিয়া শ্রীপতির চোখ কপালে উঠিয়া যায়।

কিছু কিছু অশ্লীল আলোচনায় শ্রীপতির আপত্তি নাই, গ্রামে দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে ও ধরণের গল্পগুজবে সে আমোদও পাইত, কিন্তু জ্যোতির মুখের একবারে আটক নাই, অনায়াসে এমন সব কদর্য্য মন্তব্য সে করে, এমন বীভৎস বর্ণনা শোনায়, যে কিছুক্ষণের জন্য শ্রীপতির কল্পনার নরক সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিয়া বসে।

জ্যোতি নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনায়। আগে যাদের বাড়ী কাজ

করিয়াছে তাদের সম্বন্ধে উদ্ভট ও অকথ্য কাহিনী ফলাও করিয়া রং চড়াইয়া বলিয়া যায়।

মন্তব্য করে, 'সব মেয়েলোক ওমনি,—সব, ওদের জাতটাই বজ্জাত।'

শুনিয়া শ্রীপতির বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে।

কদম ওদিকে কি করিতেছে কে জানে!

বাড়ীতে শুধু বুড়ী মা, ভাল দেখিতে পায় না। বিনয় হালদার হয়তো আবার মাছ ধরিবার ছলে ছিপ হাতে বাড়ীর পিছনে বিলটার ধারে বসিয়া থাকে, দীনু হয়তো নানা ছুতায় বাড়ী আসিয়া গল্প জুড়িয়া দেয়। ইন্দ্র এই জ্যোতির মত চুল ছাঁটে, কদমকে দেখিলেই সে শিস্ দিতে দিতে চলিয়া যাইত, সে চলিয়া আসিবার পর এখন হয়তো চলিয়া যায় না! কদম তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িত, এখন হয়তো দাঁড়াইয়া থাকে।

কে জানে কি করিতেছে কদম?

চার বছর কদম ঘর করিতে আসিয়াছে, চার বছর কদম হাসে নাই। কাছে টানিতে গেলে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিয়াছে, এত কেন? পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই যে তিন ব্যাটাবেটির বাপ যোয়ান মদ্দ পুরুষের, তার অত সখ কেন? দিনরাত কানের কাছে মন্ত্র জপ করিয়াছে, গয়না দাও, শাড়ী দাও, মাছ দুধ খেতে দাও, আমি তোমার তিন ব্যাটাবেটির মা বুড়ি বৌ তো নই, আমার ওসব চাই। নিজের কচি ছেলেটা তার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, বৌকে শাপিতে শাপিতে শ্রীপতির মা কাঁদিয়া ফেলিত, গুম খাইয়া কদম বসিয়া থাকিত। তাতানো লোহা হাতে শ্রীপতি তাকে শাসন করিতে আসিলে মুখ তুলিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কদম বলিত, 'আমি কাবে মা নই। ছেলের মার বুকে দুধ থাকে, এক ফোঁটা দুধ আছে আমার বুকে?'

বলিতে বলিতে কদম উঠিয়া দাঁড়াইত, ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল সরাইয়া বুক উদলা করিয়া দিত, সামনে রুখিয়া আসিয়া বলিত, 'কেটে নাও, দা' দিয়ে কেটে নাও মাই, রক্ত যা পড়বে তাই খাইও ছেলেকে।'

তারপর কদম হাসিয়াছিল।

পয়সা রোজগার করিতে সে বিদেশে যাইবে স্থির হওয়ার পর।

একেবারে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছিল কদম। নিজেই গলা জড়াইয়া ধরিত, না বলিতে পিঠের ঘামাচি মারিয়া দিত, কিভাবে তাকে প্রসন্ন করিবে ভাবিয়া যেন দিশেহারা হইয়া থাকিত। জট ছাড়াইয়া সে মৃতা সতীনের মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিয়াছিল এতকাল পরে, সতীনের ছেলের খোস প্যাঁচড়া সাফ করিয়া নিমপাতা লাগাইয়া দিয়াছিল।

এত করিয়াছিল কদম তাকে দূরে পাঠানোর জন্য! পয়সা রোজগার করিতে দূরে পাঠানোর জন্য! এখন সে কি করিতেছে?

নির্ভরশীল সরলবিশ্বাসী হাবাগোবা মানুষটাকে জ্যোতির খুব পছন্দ হইয়া গেল। কথা শুনিতে শুনিতে এমন অভিভূত বিচলিত হইয়া না পড়িলে কি আর কারো কাছে বাহাদুরী করিয়া সুখ হয় মানুষের?

জ্যোতির কবি মন নিজেকে কেন্দ্র করিয়া গৌরবগাথা সৃষ্টি করে, উদাহরণ-সমেত জীবনের ব্যাখ্যা শোনায়, দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত ললনাকুলের হৃদয়রাজ্য জয় করে, চাণক্যের মত বুদ্ধি কৌশলে শত্রু নিপাত করে, শুধু ভাঁওতা দেওয়ার ক্ষমতায় বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পায়। বিব্রত হইয়া অভিভূত হইয়া উত্তেজিত হইয়া শ্রীপতি তার কথা শোনে। বুঝিতে পারা যায় সে ভাবিয়া পাইতেছে না এই বীরপুরুষটি, বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি সতের টাকা বেতনে মোহনের বাড়ী চাকরের কাজ করিতেছে কেন!

জ্যোতি তৃপ্তি লাভ করে।

লেখকের যেন ভক্ত জুটিয়াছে, ধনীর যেন পার্ষদ জুটিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার পর জ্যোতি গেঁয়ো মানুষটিকে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাগ দিয়া ধন্য করার জন্য সঙ্গে নিয়া গেল।

বাড়ীর পিছন দিকটা দক্ষিণ, সে দিকে কয়েক মিনিট হাঁটিলেই সহরের

পুরানো দিনের সব বাড়ী মেলে, বাড়ীগুলির সামনে পিছনে অলিগলিতে কিছুক্ষণ পাক খাইতে খাইতে আগাইয়া গেলে পাওয়া যায় খোলার ঘরের এক বস্তি। সেখানে দুদিকের মাটির দেয়াল হইতে গা বাঁচাইয়া প্রায়ান্ধকারে চলিতে চলিতে জানালা দিয়া চোখে পড়ে আলোকিত ঘর, চেনা অচেনা অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্য দুয়ারে দুয়ারে সাজগোজ করিয়া খোঁপায় মালা জড়াইয়া মেয়েদের দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। সস্তা হারমোনিয়ামের সঙ্গে জবরদস্তি গান, হাসির হুল্লোড় আর বচসা কানে আসে, সমস্ত শব্দ ভেদ করিয়া চড়া তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদও মাঝে মাঝে শোনা যায়।

এই সরু গলিতে এত মানুষের চলাচল দেখিয়া শ্রীপতি অবাক হইয়া যায়। বস্তিতে ঢুকিবার আগে মনে হইয়াছিল জ্যোতি বুঝি তাকে গরীবের শান্ত স্তব্ধ ঘিঞ্জি এক পল্লীতে নিয়া চলিয়াছে, এখন সে অনুভব করে চারিদিকে অনেকখানি পরিধির মধ্যে সমস্ত পাড়াটা মৌচাকের মত মুখরতা আর ব্যস্ততায় সরগরম।

চাঁপার ঘর।

এখানকার অনেক খোলার ঘরেও বিদ্যুতের আলো জ্বলে, চাঁপার ঘরে লণ্ঠন। মেঝেতে বিছানা পাতা, চাদরটা ফর্সাই মনে হয়, গোটা তিনেক বালিশ আছে, তাদের ওয়াড়গুলি ময়লা আর একটু ছেঁড়া। এককোণে উপুড় করা ঘষামাজা বাসন, কাঠের আলনায় মোটে দু'টি শাড়ী, একটি সেমিজ আর একটি গামছা, পুরাণো পাড়ে তৈরী ঢাকনা দেওয়া একটি বাক্স, দেয়ালে আঠা দিয়া আটকানো আর পেরেকে লটকানো অনেকগুলি ছবি, কোনটা পুরাণো ক্যালেণ্ডারের, কোনটা মাসিক পত্রের, মিলের কাপড়ে যে ছবি আঁটা থাকে, তাও আছে। হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে নধর বালগোপাল, স্থূলাঙ্গী উলঙ্গিনী দেবদেবী, বাগানের মত সাজানো বন, উইটিবির মত পাহাড় আর নালার মত নদীতে মূর্তিমতী প্রকৃতি দেয়ালে এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া আছে।

একটি ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে। ছেলে কোলে এক গেঁয়ো মায়ের ছবি দেখিয়া।

ছবি দেখিয়া কদমকে শ্রীপতির মনে পড়ে, ঘরের মাটিলেপা দেয়াল আর সোঁদা গন্ধে মনে পড়ে দেশের বাড়ীর ঘরের কথা। একটা লণ্ঠন আছে শ্রীপতির, মাঝে মাঝে জ্বলে। চাঁপার লণ্ঠনের মত এমন পরিষ্কার আলো দেয় না, ধোঁয়া তুলিয়া মিট মিট করিয়া জ্বলে। তবু সেই আলোতেই চাঁপার বাসনগুলির মত কদমের মাজা বাসনও এমনি চক চক করে।

সেদিন দশটার ডাকে কদমের একখানা চিঠি আসিল। মোহনের ভাগ্নে সুধীর স্কুলে পড়ে, তাকে দিয়া লিখাইয়াছে।

টাকা পাঠায় না কেন শ্রীপতি? সকলে কি তারা না খাইয়া মরিবে? তাড়াতাড়ি বেশী বেশী রোজগার করুক শ্রীপতি, তাড়াতাড়ি একবার দেশে ঘুরিয়া আসুক, কদম তার পথ চাহিয়া আছে।

'কি করি কত্তা এখন?'

শ্রীপতির অসহায় বিমূঢ় ভাব আর স্ত্রীলোকের মত একান্ত নির্ভর করার স্বভাব মোহনকে বিরক্ত করে, আমোদ দেয়। আমোদ দেয় বেশী, প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা জাগে। শ্রীপতি পীতাম্বরের মত নয়, একটু আশ্রয় পাইয়াই আর সব চাওয়া সে ছাঁটিয়া ফেলে না।

'কি করবি আবার? টাকা পাঠিয়ে দে।'

'টাকা যে নেই কত্তা?'

'তবে আর কি হবে? তাই লিখে দে।'

মোহন হাসে। শ্রীপতিও যেন তার খেলা বুঝিতে পারে, নিজে হইতে তার কাছে টাকা চায় না। মোহনের কাছে চাহিলে যে পাওয়া যাইবে একথা যেন মনেই পড়িতেছে না তার। বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে সে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখের পাতা মিট মিট করে।

'তুই একটা আস্ত পাঁঠা শ্রীপতি। আমার কাছে টাকা চাইবি তাও আমাকেই বলে দিতে হবে গাধা কোথাকার?'

নিজের সহৃদয়তা কি উপভোগ্য !

নিজের আবেগের নেশায় মাতাল হওয়ার মত। দানের চেয়ে দয়ার চেয়ে উদারতার খেলা মানুষকে দেবতা হওয়ার সুখ দেয়। শ্রীপতি প্রার্থী নয়, ভক্ত। শ্রীপতির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেলে মোহন নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

মোহনের অনুরোধে জগদানন্দ শ্রীপতির একটা কাজ জুটাইয়া দিল। প্রকাণ্ড একটা কারখানা আছে, অনেকগুলি মোটর আর লরী সেখানে ভাড়ার জন্য মজুদ থাকে, রাশি রাশি গাড়ী মেরামত হয়।

একটা মজুরকে কাজ জুটাইয়া দিবার অনুরোধ শুনিয়া জগদানন্দ একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তার নিজের একজন ম্যানেজার বেতন পায় হাজার টাকা, তার অনুমোদনে মানুষের দু'শো চার শো টাকার কাজ জোটে, তাকে দিয়া একজন কুলীর কাজ জোটানো !

অনুমোদনের একি অপচয় ! তারপর একটু হাসিয়া একটা স্লিপ লিখিয়া মোহনের হাতে দিয়া বলিয়াছিল, 'এটা নিয়ে ফ্যাক্টরীতে যেতে বলুবেন।'

অতি অল্প দিনে জগদানন্দের সঙ্গে মোহনের ভাব জমিয়া গিয়াছে। দু'জনের বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে।

সর্ব্বদা যাতায়াত চলে, হাসি, গল্প, গানবাজনা, খেলাধুলায় সময় কাটে। কোথাও যাইতে হইলে দু'বাড়ীর সকলে একত্র হইয়া যায়—সিনেমায়, পিকনিক করিতে অথবা জগদানন্দের যে দু'একজন বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে মোহনের বাড়ীর সকলেরও পরিচয় হইয়াছে, তাদের বাড়ীতে।

জগদানন্দের স্ত্রী উর্ম্মিলা সুন্দর গান জানে।

গলাটি মিষ্টি। মানুষটা রোগা, গলাটি সরু কিন্তু গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ নয়, ঝঙ্কারে সার্থক ও মধুর। তার গান শুনিয়া মোহন মুগ্ধ হইয়া যায়।

গানের সুরে তার স্বামীকে এভাবে মুগ্ধ করার জন্য লাবণ্য তাকে একটু হিংসা করে।

অন্যপক্ষে, লাবণ্যের রূপ দেখিয়া মাঝে মাঝে জগদানন্দের চোখে দু'একটা পলক পড়ে না। রূপের জন্য লাবণ্যকে উর্মিলা একটু হিংসা করে।

চিন্ময় বড় ব্যস্ত। দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে মোহনের পরিচয় করাইয়া দিয়াই হঠাৎ সে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, সামাজিক জীবনে সময় দিতে পারে না। অফিসে কি যেন হাঙ্গামা বাধিয়াছে, পিতাপুত্রের এক মুহূর্ত্ত অবসর নাই। যতটুকু সময় বাড়ীতে থাকে দু'জনে এক সঙ্গে বসিয়া কাগজপত্র ঘাঁটে আর পরামর্শ করে।

কি হইয়াছে কেউ জানে না, তবে দু'জনের ভাবসাব দেখিয়া বাড়ীর লোকেরাও একটু হকচকাইয়া গিয়াছে।

ঝরণা বলে, 'মেজাজ যা হয়েছে দু'জনের, কি বলব আপনাকে। আমরা কেউ কাছে ঘেঁষি না।—নগেন আসে না যে? বেশ লাগে আপনার ভাইকে। এমন ছেলেমানুষ!'

নগেন ছেলেমানুষ বৈকি।

ছেলেমানুষকে ছেলেমানুষ বলার মানে মোহন বুঝিতে পারে না।

'সে রকম ছেলেমানুষ বলছি না, কলেজে পড়ে তবু খুব সরল। মিন্টু সিগারেট খায়, আমি সেদিন নগেনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি খাও না? বললে কি জানেন? না, খাই না, দাদা বারণ করেছে! আপনাকে খুব ভয় করে। শাসন করেন বুঝি খুব?'

'শাসন? শাসন করার দরকার হয় না। আমায় খুব ভালবাসে। আমি যা পছন্দ করব না ভাবে, কখনো তা করে না।'

ঝরণা গম্ভীর মুখে বলে, 'তারই নাম শাসন করা। আর কি শাসন করবেন, বেত লাগাবেন? বড় ভাই সেজে থেকে ওর মনটা আপনি দমিয়ে রাখেন। ভাবলে এমন আশ্চর্য্য হয়ে যাই, আপনারা সব বোঝেন না যে, চেপে রাখলে এই বয়সে কারো মনের স্বাধীন বিকাশ হতে পারে না?'

ঝরণার কথার ঝাঁঝ মোহনের মনে গিয়া লাগে। কিছু সে বলিতে পারে না।

ঝরণা শুধু তাকে দোষ দেয় নাই। সব বড় ভাইদের,—গুরুজনদের, বিরুদ্ধে তার নালিশ! মৃন্ময়ের জন্য হয়তো ঝরণার মনে গভীর দুঃখ আছে। মানুষের চোখে চোখে তাকানোর ভয়ে ভাইটি ঝরণার সব সময় আড়াল খোঁজে। ঝরণা কি সেজন্য দোষী করে চিন্ময়কে? বড় ভাই সাজিয়া থাকিয়া চিন্ময় তার ভাই-এর বিকাশোন্মুখ মনকে কোঁকড়াইয়া দিয়াছে?

মোহন বিশ্বাস করিতে পারে না।

'মিনু কি এইজন্য এত নার্ভাস হয়েছে?'

ঝরণার মুখ লাল হইয়া গেল। বুঝা গেল, ভাই-এর জন্য মনে মনে তার লজ্জা আছে।

'মিনু? ওর কথা আলাদা। ছেলেবেলা থেকেই মিনু ওরকম, গ্ল্যাণ্ডের দোষ আছে। চিকিৎসা হচ্ছে, সেরে যাবে। ওকে নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।'

•

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মোহন জগদানন্দের কাছে তার ছোট ভাই-এর ইতিহাস শুনিল। তারা তিন ভাই। ছোটজনের নাম নয়নানন্দ। এখনো সে বাঁচিয়া আছে—শুধু বাঁচিয়া আছে।

গঙ্গার ধারে একটি বাড়ীতে বিছানায় শুইয়া তার দিন কাটে। অর্দ্ধেক অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, উঠিতে পারে না। নার্স তার সেবা করে, বৌ অনেকদিন আগেই বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভোঁতা মস্তিষ্কে বাহিরের জগৎ অতি ক্ষীণ সাড়া তোলে, সময় সময় মনে হয় সেটুকু বাহ্যজ্ঞানও বুঝি নাই। জগদানন্দ যদি কখনো যায়, যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছিস? অর্থহীন অভ্যস্ত হাসির একটু আভাস হয়তো কখনো ঠোঁটের কোণে ফুটিয়া ওঠে, কখনো মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে, পলক পড়ার বদলে চোখের পাতা শুধু কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

'কদাচিৎ দেখতে যাই। সহ্য হয় না।'

তবু জগদানন্দ চায় না সে সুস্থ হইয়া উঠুক !

কোন রকমে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতা হইতেই আবার আত্মঘাতী তাণ্ডব সুরু করিয়া দিবে, ভাল করিয়া সরিয়া উঠিবার জন্যও অপেক্ষা করিবে না।

আরেকবার তিন মাস ভুগিয়াছিল, জগদানন্দ কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ডাক্তার আশা করিতেছে দু'চার দিনের মধ্যে সলিড ফুড দেওয়া চলিবে, হঠাৎ দেখা গেল সে বাড়ী নাই। সেই অবস্থায়, উঠিয়া দাঁড়াইলে যখন টলিয়া পড়ার উপক্রম করে, কোন সুযোগে উর্ম্মিলার বাক্স খুলিয়া গয়না নিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। দু'দিন পরে খবর আসিল অজ্ঞান অবস্থায় সে হাসপাতালে পড়িয়া আছে।

ধ্যানধারণা ধর্ম্মালোচনা ছাড়া দাদা থাকতে পারতেন না, নোংরামি ছাড়া নয়ন থাকতে পারে না। দাদা তবু শরীর একটু ভার বোধ করলেই সব বন্ধ করে দিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক পর্য্যন্ত করতেন না। নয়নের সাধনা আরও জোরালো. মরতে মরতেও প্রাণপণে নিজের তপস্যা চালিয়ে যায়। আমার কি মনে হয় জানো মোহন ? দাদা যদি অতবড় মহাপুরুষ না হতেন, নয়নের বিকারটা এমন চরমে দাঁড়াত না।'

মোহন চুপ করিয়া রহিল।

প্রথম অপরাধ করেছিল সতর আঠার বছর বয়সে। অনেক বাড়ীতে অনেক ছেলেই ওরকম অপরাধ করে। কোন বাড়ীতে একটু শাসন করা হয়, কোন বাড়ীতে শুধু উপদেশ দেওয়া হয়, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। ছেলেটা কিছু দিন মুখ দেখাতে লজ্জা পায়, তারপর ধীরে ধীরে সামলে ওঠে। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে ছিলেন দাদা, আধ লাখ স্ত্রী পুরুষ যাকে দেবতার মত পূজা করে। দাদার দোষ দিই না। তিনি কিছুই করেন নি। তিনি শুধু ছিলেন, আর কিছু নয়। বাড়ীর সকলে নয়নের ছেলেমানুষীর কথা ভুলে গেল, কিন্তু সে যেন কেমন হয়ে গেল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া চলছিল। নিজে কি করেছে না করেছে তার চেয়ে তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল, এমন দাদার ভাই হয়ে সে অপরাধটা করেছে।'

'ওরকম হয়।'

'হ্যাঁ, একজনের মন যখন অন্য একজনের বশে থাকে, তখন সে নিজের কাজের গুরুত্ব যাচাই করে অন্য একজনের মাপ কাঠিতে। দাদা একটি মেয়েকে ভাল-বাসার চিঠি লিখে কেলেঙ্কারি করলে সেটা যেমন সৃষ্টিছাড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার হত, নিজের কাণ্ডটা নয়নের কাছে ঠিক ততখানি গুরুতর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গদোষ ঠিক এইভাবে কাজ করে।'

ঝরণার অভিযোগটা সে তেমন আমল দেয় নাই। কথাটা সত্য সন্দেহ নাই, বড়গাছের ছায়ায় চারাগাছ বাড়িতে পায় না, কিন্তু দুর্ভাবনার কি আছে? নগেনকে সে নিজের ছায়ায় ঢাকা দেয় নাই।

সংসারে সাধারণত বড় ভাই-এর কাছে ছোট ভাই যতটা প্রশ্রয় পায়, যতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, তার অনেক বেশীই সে বরাবর নগেনকে দিয়া আসিয়াছে। গোপনে সিগারেট খাওয়া ধরিয়াছে জানিয়া উদারভাবে সে তাকে সামনে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি পর্য্যন্ত দিয়াছিল। কোনরকমে ছোট ভাইকে দাবাইয়া রাখিবার, দমাইয়া দিবার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড় করাইতে পারিবে না।

নগেন কিন্তু সিগারেট খাওয়া সম্পর্কে তার উদারতার মানে বুঝিয়াছিল উল্টা, ভাবিয়াছিল সে তিরস্কার করিতেছে।

আরও অনেক প্রশ্রয় দেওয়া, স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারেও কি নগেন এইরকম উল্টা বুঝিয়াছে?

জগদানন্দের বেদনাবোধ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ায় এখন তার ভয় করিতে থাকে। নয়নানন্দের দৃষ্টান্তটা অসাধারণ। সে পরমানন্দের মত মহাপুরুষ নয়, নয়নানন্দের মত নিজেকে ধ্বংস করার প্রতিভাও নগেনের নাই। অমন সর্ব্বগ্রাসী বিকারও নগেনের কোনদিন জন্মিবে না। কিন্তু তার আওতায় সাধারণ মানুষের ভাই হিসাবে সাধারণ ভাবেই নগেন যদি বিগড়াইয়া যায়?

সে ক্ষতিও তো সহজ নয়।

মোহন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া যায়।

নগেন কি করিতেছে দেখিতে হইবে। নগেনের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা বলিয়া বুঝিবার চেষ্টে করিতে হইবে মনটা তার কি অবস্থায় আছে।

মোহন বুঝিতে পারে এটা তার দুর্ব্বলতা, এসব ব্যাপারে এমনভাবে অধীর হইতে নাই। কিন্তু চরম উদাহরণের মত নয়নানন্দের কাহিনী বড় ও ছোটর সম্পর্কের একটা দিক তার কাছে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তার কেবলি মনে হইতে থাকে, এতকাল এ বিষয়ে উদাসীন থাকা তার উচিত হয় নাই।

নগেনের মত ভাই বয়স্ক পুত্রের মত। বাপ বাঁচিয়া থাকিলে আলাদা কথা ছিল। গ্রামে হোক, সহরে হোক, ভাইকে মানুষ করিবার দায় এড়াইয়া গেলে ওই ভাইটার জন্যই তার নিজের জীবনেও অনেক অবাঞ্ছিত বিপর্য্যয় দেখা দিবে।

এমনি ব্যাকুলভাবে সে বাড়ীতে পৌছায়, একতলা হইতেই শুনিতে পায় নগেনের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ!

মোহন জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে।

নিজে কলেজে পড়ার সময় বালক নগেনের অসুখের খবর পাইয়া একবার সে ব্যাকুল হইয়া বাড়ী গিয়াছিল, সমস্ত পথ ভাবিয়াছিল, নগেন বাঁচিয়া আছে দেখিতে পাইবে তো?

বাড়ীর সামনে নগেনকে চাদর গায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেদিনও তার এমনি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িয়াছিল।

মোহন একটু লজ্জা বোধ করিতে থাকে। মাঝে মাঝে কি যেন তার হয়, সামান্য ব্যাপারে একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে। কল্পনায় কোন খুঁত হয় তো আছে, মাঝে মাঝে সাধারণ বিচারবুদ্ধির বাধা ভাঙ্গিয়া উদ্দাম উল্লাসে খেলা সুরু করিয়া তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

ঝরণা সকলকে হাসাইতেছিল আর বিস্মিত দৃষ্টিতে নগেনকে দেখিতেছিল। এত সহজে যে কোন কিশোরকে এভাবে হাসানো যায় সে বোধ হয় বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ছেলেমানুষ? এমন পাকা আর চালাক ছেলেমানুষ?

মোহনকে দেখিয়া সকলের হাসি থামিয়া গেল।

লাবণ্য খসা আঁচলটি খোঁপায় আটকাইয়া দিল। হাসির শব্দ বন্ধ হইলেও অন্য সকলের মুখে হাসি লাগিয়া ছিল, নগেনের মুখে শুধু হাসির চিহ্ন নাই। এক মুহূর্তে এতক্ষণের আত্মভোলা ছেলেটা সচেতন ও সংযত হইয়া গিয়াছে।

দেখিয়া হঠাৎ মোহনের মাথাটা যেন খারাপ হইয়া যায়।

সে কারও গুরুজন? ভারিক্কি গম্ভীর মানুষ সে?

সে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র সকলের উচ্ছ্বসিত হাসি থামিয়া যায়, হাসি বন্ধ করিয়া তার ভাই চোরের মত চাহিয়া থাকে?

মিথ্যা কথা! অতি ফাজিল, অতি হাল্কা মানুষ সে, এতটুকু তার গাম্ভীর্য্য বা আত্মমর্য্যাদাবোধ নাই।

থিয়েটারের কমিক অভিনেতার মত হাস্যকর অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে পা টেপা' টেপা' দৌড় দিয়া গিয়া সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়ে, বেখাপ্পা উল্লাসের সঙ্গে ব্যগ্রভাবে 'কি কি—কি ব্যাপার? শুনি, আমিও একটু শুনি!'

স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলে ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

মোহনের মাথা ঘুরিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতে থাকে। সে জানে এখন থামিবার উপায় নাই। অস্বাভাবিক কিছু করিয়াছে স্বীকার করিলে চলিবে না।

'কখন এলে ঝরণা?'

ঝরণা উঠিয়া দাঁড়ায়, মুচকি হাসিয়া বলে, 'ও, এই ব্যাপার! এক কাজ করো বৌদি, দু'টো তিনটে লেবু কেটে সরবৎ করে খাইয়ে দাও। এত ভড়কে যাচ্ছ কেন? একেবারে অভ্যাস নেই, কার সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে দু' এক পেগ খেয়েছেন —মাথা ঘুরে গেছে। এতে ভাবনার কি আছে?'

পাঁচ

মোহন একদিন সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

নিজের গাড়ীতে ষ্টেশনে আসিয়া মোহন ট্রেণ ধরিল। অত দামী গাড়ী নিয়া সন্ধ্যার বাড়ী যাইতে তার যেন কেমন লজ্জা হইতেছিল। কলেজে পড়ার সময় মোহনের বড় টানাটানি চলিত। বেশী টাকা হাতে পাইলে ছেলে বিগড়াইয়া যাইবে ভয়ে বাবা তাকে টাকা পাঠাইত হিসাব করিয়া।

সন্ধ্যা হয়তো জানে তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। হঠাৎ অত দামী একটা গাড়ী নিয়া হাজির হইলে সে হয়তো ভাবিয়া বসিবে, গাড়ীটা দেখাইতে সে গিয়াছে, নিজের বড়লোকত্ব ঘোষণা করা তার উদ্দেশ্য। মনে মনে সন্ধ্যা হয়তো একটু হাসিবে। তার চেয়ে আগে যেমন ট্রেনে বাসে ওদের বাড়ী যাইত, আজও তেমনি ভাবেই যাওয়া ভাল।

কলিকাতা আসিয়াই একদিন সন্ধ্যার বাড়ী যাইবে ভাবিয়াছিল। বিবাহের পর সন্ধ্যাকে দেখে নাই, দেখিতে খুব ইচ্ছা হইতেছিল। তবু এতদিন যাই যাই করিয়া শুধু দিন পিছাইয়া দিয়াছে।

চিন্ময়কে না জানাইয়া সন্ধ্যার কাছে যাওয়া যায়। সে অধিকার তার আছে। চিন্ময়ের সঙ্গে সন্ধ্যার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার আগে সে তাদের বারাকপুরের বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছে, সন্ধ্যার সঙ্গে তাদের প্রকাণ্ড বাগানে হাঁটিয়া বসিয়া গল্প করিয়াছে, ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া দু'জনে গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গিয়াছে অনেক দূর।

চিন্ময়ের স্ত্রীর সঙ্গে নয়, সন্ধ্যার সঙ্গে সে যখন খুসী গিয়া দেখা করিয়া আসিতে পারে। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া চিন্ময়কে বলিতে হইবে। একথা বন্ধুর কাছে গোপন করা চলে না। একেবারে উল্লেখ না করার মত তুচ্ছ নয় কথাটা!

সন্ধ্যা তাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে কয়েক বছরের মতো। দুজনের মধ্যে চিঠি লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ। এ অবস্থায় সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে চিন্ময়ের কাছে তা গোপন করা যায় না।

এই জন্য কি এতদিন সে যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যার কাছে যায় নাই? চিন্ময়কে পরে বলিতে হইবে, এই ভয়ে? হয়তো ঠিক এই ভয়ে নয়, কথাটা আজ তার খেয়াল হইয়াছে প্রথম। তবে মনান্তরের ফলে দু'জনে তারা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যে একজনের সহিত মাথামাথি করিতে করিতে আরেকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইতস্তত করিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা আসিয়া প্রথমে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হইলে চিন্ময়ের কাছে যাইতে সে হয়তো ঠিক এমনি অস্বস্তি বোধ করিত।

কি ভাবিবে চিন্ময়, কি বলিবে? যদি সে ভাবিয়া বসে যে মোহন তাদের মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিল? একথা ভাবিয়া যদি সে রাগ করে? যদি হঠাৎ চিন্ময়ের দুরন্ত আশা জাগে যে মোহনের কথা শুনিয়া সন্ধ্যা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, এবার সে ফিরিয়া আসিবে?

ট্রেণ চলিতে থাকে আর মোহন এমনি সব জল্পনা কল্পনা করিতে থাকে। সন্ধ্যার সঙ্গে তার কি কথা হইয়াছে শুনিবার জন্য চিন্ময় হয়তো আগ্রহে ফাটিয়া পড়িবে কিন্তু আপনা হইতে মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। যাচিয়া তাদের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ শুনাইতে সেও লজ্জা বোধ করিবে। চিন্ময় হয়তো শুধু জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন আছে? সে জবাব দিবে যে ভালই আছে—এবং তার পর হয়তো চিন্ময় জোর করিয়া অন্য প্রসঙ্গ টানিয়া আনিবে।

বাগানের গাছে গাছে তখন শেষরাত্রির বৃষ্টির জল রোদের তেজে শুকাইয়া যাইতেছে, ঘুমের বিছানা ছাড়িয়া সন্ধ্যা চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল বাথরুমে চীনা মাটির পুকুরে স্নানের বিছানায়।

রুক্মিণীর কাছে খবর শুনিয়া বলে, 'মোহন এসেছে, মোহন! চুলে সাবান দেব ভাবছিলাম, মোহন এসেছে! জানতম আসবে।'

বাহিরের ঘরে মোহন ভাবে: এতক্ষণ আমায় বসিয়ে রেখেছে সন্ধ্যা? আর কেউ কি বাড়ীতে নেই? সকালে কেউ কি বাইরে আসে না?

আরও খানিক পরে সন্ধ্যা আসিয়া বলিল, 'এই যে আমার মোহন। আমার অসময়ের মোহন।'

সামনে আসিয়া ডান হাতটি তুলিয়া দু'হাতে মুঠা করিয়া ধরিল। ভিজা ভিজা ঠাণ্ডা হাত দুটি সন্ধ্যার, গায়ে সাবানের সুবাস। প্রসাধন না করিয়াই আসিয়াছে।

—'এসেছো তা' হলে?'

সন্ধ্যা খুসী হইয়াছে।

সহজ হাসি, কথা আর দুর্লভ অন্তরঙ্গতা দিয়া সন্ধ্যা তাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। এর মধ্যে ফাঁকি কিছু নাই, সবটাই আন্তরিক।

তবু মোহন যেন আশাভঙ্গের আঘাতে একেবারে নিভিয়া গেল।

সন্ধ্যা আশ্চর্য্য হইয়া গেল না, এতটুকু তার উত্তেজনা জাগিল না, কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল না, এমনভাবে তাকে গ্রহণ করিল যেন বহুকাল পরে জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিবার পরে তাদের দেখা হয় নাই, যেন কালও সে আসিয়াছিল! সন্ধ্যা তার সঙ্গে শুধু ভদ্রতা করিবে, শুধু জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন আছে, কোথায় আছে, কি করিতেছে—এসব ভাবিয়া আসিলে বিনা ভূমিকায় তাকে এভাবে কাছে টানিয়া নেওয়ার জন্য হয়তো সে কৃতার্থ হইয়া যাইত। অনেক বিচিত্র নাটকীয় ব্যবহার কল্পনা করিয়া আসিয়া এমন আবেগহীন সহজ অভ্যর্থনা কি ভাল লাগে?

'কেমন আছ সন্ধ্যা?'

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল—'ওসব নয় মোহন। ভাল লাগে না। দেখতে পাচ্ছো না কেমন আছি?'

তবু যেন মোহন হার মানিবে না, দীর্ঘ অদর্শনের ব্যবধানকে গায়ের জোরে

খাড়া করিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে সে ব্যবধান অতিক্রম করার বৈচিত্র্য উপভোগ করিবে।

'রোগা হয়ে গেছ।'

তখন সন্ধ্যার বোধ হয় মনে পড়িয়া যায় যে ঠিক এই রকম একগুঁয়েমি করিয়া আগেও মোহন তাকে মাঝে মাঝে পাগল করিয়া তুলিত, আব্দেরে ছোটছেলেকে চকোলেট দেওয়ার মত কিছু ভাবপ্রবণতার ব্যথা মোহনের মধ্যে তাকে সৃষ্টি করিয়া দিতে হইত।

ব্যথা বোধ হয় আজ সে চায় না। একটু উচ্ছ্বাস চায়, বিস্ময় আর আনন্দের! সেই সঙ্গে এতদিন অবহেলা করার জন্য কিছু কিছু অভিমান মিশাইয়া দিলে মোহন আরও খুসী হইবে।

কিন্তু কেন?

কেন সকলে তার কাছে এসব চায়, তার যা নাই, সে যা ভালবাসে না? সমস্ত জগৎ যেন ধরিয়া রাখিয়াছে মেয়ে বলিয়াই সে রক্তমাংসের জীবন্ত কবিতা—পুরুষের মনের মত কবিতা।

কিন্তু মোহন তাকে বড় খাতির করিত, ভাল ছেলে মোহন। বাঁচার আনন্দে ভাঁটার সময় শুধু এই মোহনকে তার ভাল লাগিত। যখন মনে হইত জীবনে আর কিছু নাই, শুধু শ্রান্তি আর বিরক্তি,—কিছুক্ষণের জন্য যখন একেবারে লোপ পাওয়ার সাধ জাগিত, পোষা কুকুরটা ছাড়া কারো সঙ্গ সহ্য হইত না, মোহনের সঙ্গে তখন কথা বলিতে পারিত,—যে কোন বিষয়ে কথা হোক। কুকুরটা কবে মরিয়া গিয়াছে। মোহন এখনও আছে, দুধ ভাত আর সুখ শান্তিতে পরিপুষ্ট দিব্যকান্তি মোহন। ভাল ছেলে মোহন, ধৈর্য্যময় মোহন, সহনশীল নিয়মতান্ত্রিক একগুঁয়ে মোহন।

ওকে কিছু ভাবালুতার খোরাক তার দেওয়া উচিত।

সন্ধ্যা বসিল, গা এলাইয়া দিল।—'মানুষ কেন রোগা হয় তুমি কি বুঝবে? শরীরটা ভাল নেই মোহন।'

মোহন প্রায় আধ মিনিট চুপ করিয়া রহিল। কোনদিন বোঝে নাই, আজ কি আর সে বুঝিবে এই নীরব সহানুভূতি কত অসহ্য সন্ধ্যার কাছে?

'তোমার সুখী হওয়া কঠিন, সন্ধ্যা! যা জিদ্ তোমার!'

'ইস? তার মানে?—ও, জিদ! যাকগে, সুখদুঃখের কথায় কাজ নেই। বৌকে সঙ্গে আনলে না কেন, আলাপ করতাম? আচ্ছা, আমিই তোমার বাড়ী গিয়ে আলাপ করে আসব একদিন।'

মোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তুমি জানলে কি করে আমি বাড়ী নিয়েছি?'

'ওর কাছে শুনলাম।'

'সত্যি? চিন্ময় তবে এসেছিল? তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম, তোমাদের বুঝি কথাও বন্ধ।'

'বন্ধু তোমার আসে নি, তবে আমাদের কথা বন্ধ নয়। দরকার হলে আমরা ফোনে কথা বলি।'

মোহন ধীরে ধীরে বলিল, 'দরকার হলে ফোনে কথা বলো। কি রকম দরকার হলে?'

সন্ধ্যা একটু হাসিল।

'যেমন ধরো আমার কিছু বাড়তি টাকা চাই। আমি ফোন করে টাকার কথা বলি, ও লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেয়।'

'শুধু টাকার কথা বলো? আর কেন কথা হয় না?'

'হয় বৈকি।'

সন্ধ্যার মুখের হাসি নিভিয়া যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে মোহনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে, ভুরু কুঁচকাইয়া বলে, 'খারাপ লাগছে শুনতে? আমাকে ভোগ করতে দিই না, তবু টাকা চেয়ে নিই, এটা খুব খাপছাড়া মনে হচ্ছে? তাতো মনে হবেই, তোমরা পুরুষ মানুষ যে! বিয়ে করবার আগে তোমরা বড় বড় কথা বলতে পার, বিয়ের পর সে সব কথা মনে রাখলে দোষ হয় আমাদের। সবাই নাকি জানে ওসব বড় বড় প্রতিজ্ঞা ভালবাসার প্রলাপ! সবাই জানে জানুক, আমি জানি না। জানতে

চাই না। বিয়ে করবার জন্ম পায়ে ধরে তো সাধিনি আমি? স্পষ্ট বলেছিলাম, টাকার জন্য তোমায় বিয়ে করছি, যা খুসী করব, যেখানে খুসী থাকব, কিছু বলতে পাবে না। ভাল না লাগে একসঙ্গে থাকব না, কিন্তু যতকাল বাঁচি আমায় টাকা দিয়ে যেতে হবে। মাসে মাসে আমার মিনিমাম কত টাকা চাই তাও বলেছিলাম। ও যদি মনে করে থাকে আমার সে সব ছলনা, আমি দুষ্টামি করে আবোল তাবোল বকছি, ওর সঙ্গে খেলা করছি, তার জন্য কি আমি দায়ী? তোমরা যে কি দিয়ে গড়া বুঝতে পারি না, এখনো ওর ভুল ভাঙলো না। এখনো বিশ্বাস করে আমি ওকে ভালবাসি, আমার একটা পাগলামির পিরিয়ড চলছে, এটা কেটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভালবাসায় তুমি বিশ্বাস কর না?'

'না।'

'তুমি কখনো ফিরে যাবে না?'

'না।'

মোহন যে জিদের কথা বলিয়া অনুযোগ দিয়াছিল তারই স্পষ্ট প্রমাণের মত এমন স্পষ্ট জবাব দিলে আর কি বলা যায়?

ভালবাসায় বিশ্বাস করে না। বাস্তব জীবনে যেসব চলতি এবং সর্ব্বজন স্বীকৃত ফাঁকি আছে সেগুলিকে ফাঁকি বলিয়া মানিতে চায় না। সব ফাঁকি নয়—যেগুলি না মানিলে তার নিজের সুবিধা হয়, কেবল সেইগুলি। যেমন বিবাহের আগে প্রেমের উন্মাদনায় চিন্ময় যেসব আবোল তাবোল কথা বলিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার মত, চুক্তির মত ওই কথাগুলি চিন্ময়কে সারা জীবন মানিয়া চলিতেই হইবে!

এ বিষয়ে আর আলোচনা হইল না। ভবিষ্যতে হইবার আর কোন সম্ভাবনাও রহিল না।

মোহনের একবার ইচ্ছা হইল সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করে, চিন্ময় টাকা দিতে অস্বীকার করিলে সে কি করিবে? কিন্তু ইচ্ছাটা সে চাপিয়া গেল।

কারণ তার মনে পড়িয়া গেল, সোজাসুজি ওদের ঝগড়া হয় নাই। এভাবে চিরকাল চলিতে পারে না, ঝগড়া একদিন ওদের হইবেই। সন্ধ্যার পক্ষেও আজ বলা সম্ভব নয় যে হয় আপোষ করা অথবা সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার ওই বাস্তব সমস্যা দেখা দিলে সে কি করিবে!

মোহনকে সন্ধ্যা তখন ছাড়িয়া দিল না। এ বেলা তাকে এখানে খাইতে হইবে। খাওয়া দাওয়ার পর দুজনে একসঙ্গে বাহির হইবে।

আজ শনিবার, কলিকাতায় রেস আছে। মনসুন কাপে একটা ঘোড়ায় সন্ধ্যা অনেকগুলি টাকা রিস্ক করিবে ঠিক করিয়াছে।

ঘোড়াটা জিতিবে,—জিতিবেই। এখন ফেভারিট না হইয়া যায় ঘোড়াটা, তা হইলে বেশী টাকা পাওয়া যাইবে না!

'রেসে কখনো জিতেছ সন্ধ্যা?'

'উহুঁ। রেসে কেউ জেতে?'

'তবে খেল কেন? জিততে পারবে না জেনেও টাকা নষ্ট কর কেন?'

'খেলে মজা পাই তাই খেলি।'

ট্রেণে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই, গাড়ীটাকে অসুখ সারাইতে হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যার এমন বিশ্রী লাগে ট্রেণে যাইতে!

ফোন করিয়া দিলে সহর হইতে গাড়ী নিয়া আসার বন্ধু অবশ্য আছে কয়েকজন, কিন্তু আজ যখন মোহন আসিয়াছে, দু'চার ছ'মাসের মধ্যে সে যখন আর আসিবে না, আজ আর কাউকে ডাকিয়া কাজ নাই।

সন্ধ্যা হাসে।

ভাবপ্রবণতা নাই বলে, তবু যে সন্ধ্যা এমনভাবে কি করিয়া হাসে মোহন বুঝিতে পারে না।

'আমি একটা গাড়ী কিনেছি সন্ধ্যা।'

'কিনেছো? বলো কি! বাড়ীতে ফোন করে দাও না, ড্রাইভার গাড়ীটা নিয়ে আসুক?'

এগারটার সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। বেলা একটার সময় তারা যখন বাহির হইল, তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে।

'তবু রেস খেলতে যাওয়া চাই?'

সন্ধ্যা আগের বারের মতই ভাবের উদ্দীপনার রসালো হাসি হাসে।

'বৃষ্টি থেমে যাবে।'

সহরের মধ্যে পথে নানা স্থানে জল জমিয়াছে, এক জায়গায় এত জল জমিয়াছে যে ট্রামবাস সব দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিয়া গ্রামের বন্যায় কথা মোহনের মনে পড়ে।

পথের বন্যা কয়েকঘণ্টা পরে সরিয়া যাইবে, গ্রামের বন্যা দিনের পর দিন পথঘাট গৃহাঙ্গন জুড়িয়া থাকে, ঘরও ভাসিয়া যায় অনেক। গ্রামের মানুষ চুপচাপ সহ্য করিয়া যায়, এখানে এই সাময়িক অসুবিধার জন্যও মানুষ কি ভাবে গজর গজর করে, খবরের কাগজে কড়া কড়া মন্তব্য বাহির হয়! সহরের মানুষের কি প্রাণশক্তি বেশী? নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কি তারা বেশী বোঝে?

অথবা হয়তো গ্রামের মানুষের জীবন দুর্ব্বহ করেন স্বয়ং প্রকৃতিরূপী ভগবান, যার বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে না। সহরের সুবিধা অসুবিধার ব্যবস্থা মানুষের হাতে, সহরবাসী তাই সুবিধার একটু অভাব হইলেই অসন্তোষ জানায়!

সকলে জানায় কি? সহরে উজ্জ্বল আলোর গাঢ় ছায়ান্ধকারে সহরের সব রকম সুবিধা হইতে বঞ্চিত যারা বাস করে?

ওদের সম্পর্কে মোহনের জ্ঞান ভাসা ভাসা। সে শুধু আবর্জ্জনাময় নোংরা গলি দেখিয়াছে, দিনের বেলায় বাতি জ্বালিতে হয় এমন ঘর দেখিয়াছে, বস্তি দেখিয়াছে, বাজার দেখিয়াছে, রাস্তার কলে জলের জন্য মারামারি করিতে দেখিয়াছে।

ওসব স্থান ও ঘরের সকলে নালিশ জানায় কি?

অন্যপথে গাড়ী রেস কোর্সে গেল।

এই বৃষ্টিতেও মানুষ দলে দলে রেস খেলিতে চলিয়াছে। তাদের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিলে মনে হয়, প্রত্যেকেই তারা অনেক টাকা বাজি জিতিবে, সবুর সহিতেছে না!

সস্তা এনক্লোজারের সামনে লম্বা লম্বা অনেকগুলি সারি, দেখিলেই চেনা যায় এরা সেই শ্রেণীর লোক, ট্রেণেও যারা থার্ড ক্লাসে চাপে, নিয়ন্ত্রণ করা দারিদ্র্য যাদের জীবন-ধর্ম্ম।

এদিকে মোটর গাড়ীর গাদা জমিয়া গিয়াছে, মোহনের গাড়ীটার চেয়েও কত দামী সব গাড়ী। এই সব গাড়ীর মালিকদের জিজ্ঞাসা করিলে মৃদু হাসিয়া বলিবে, 'টাকা? টাকা কে কেয়ার করে! এখানে আসা স্পোর্টসের আনন্দের জন্য।' সন্ধ্যাও যা বলিয়াছে—রেস খেলিতে মজা লাগে তাই সে রেস খেলে, টাকা জিতিবার জন্য নয়।

আনন্দ চাই, আনন্দ! যার আরেক নাম মজা!

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই জলকাদায় এত কষ্ট করিয়াও সে আনন্দ চাই?—এরা কি জবাব দিবে সে জানে।

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই একই কথা সকলে বলিবে—কষ্ট করা ছাড়া, অ্যাড্‌ভেঞ্চার ছাড়া কি আনন্দ পাওয়া যায়?

আবার যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে জলে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া কষ্ট করিলে, খাটিয়া এবং বেকারি করিয়া হাড়মাস কালো করিবার কষ্ট করিলে, রোগে আর দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে বহিবার কষ্ট করিলে, আনন্দ মেলে কি? রোমাঞ্চ মেলে কি?

এ প্রশ্নেরও এরা কি জবাব দিবে সে জানে।

বলিবে, ওটা আলাদা প্রশ্ন, ওটা কম্যুনিষ্টদের প্রশ্ন।

একজন বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার মাত্র মোহন রেস দেখিতে আসিয়াছিল, থার্ড এনক্লোজারে। ঘোড়ার দৌড়নোর চেয়ে বেশী আগ্রহের সঙ্গে দেখিয়াছিল মানুষগুলিকে।

রেসকোর্সের বাহিরের জগৎ সকলের কাছে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঘোড়া, জকি, ট্রেণার, পজিসন, রেকর্ড এসব ছাড়া জীবনে ও চেতনায় আর কোন কিছুর স্থান নাই।

ভিড়ের মধ্যে পরস্পরের গায়ে গায়ে ক্রমাগত ধাক্কা লাগিতেছে, তবু প্রত্যেকে তারা একা। যে যার নিজের হিসাবে মসগুল, কারো দিকে তাকানোর অবসর নাই।

ঘোড়া দৌড়াইবার সময় যতই ঘনাইয়া আসে তত উত্তেজনা বাড়ে, আনন্দের নেশা চরমে উঠিতে থাকে। কোন ঘোড়ার উপর টাকা লাগানো যায়, সামান্য সম্বলের কয়েকটি টাকা? অনেক হিসাব করিয়া বন্ধু দু'নম্বর ঘোড়াটি বাছিয়া টিকট কিনিতে পা বাড়াইয়াছে, পাশ দিয়া কে যেন সঙ্গীকে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, পাঁচ নম্বর সিউর, ও ঘোড়াকে মারবে কে? বন্ধু অমনি পাঁচ নম্বরের টিকিট কিনিতে ছুটিল। যে বাসে তারা আসিয়াছিল তার নম্বর ছিল ২২২, বন্ধু তাই নিঃসন্দেহ হইয়া গিয়াছিল সেদিন দু' নম্বরের ঘোড়া জিতিবে।

পর পর দু'টি রেসে হারিয়া সে বিশ্বাস ভাঙিয়া গিয়াছিল। .

ঘোড়া ছুটিতে আরম্ভ করিলে চীৎকার সুরু হয়, ঘোড়াগুলি যখন সামনে আসে, মনে হয় এতগুলি মানুষের ফুসফুস যেন ফাটিয়া যাইবে। কিছু লোক শব্দ করে না, দাঁত দিয়া জোরে ঠোঁট কামড়াইয়া থাকে, কেউ চোখ বুজিয়া বিড়বিড় করিয়া দেবতাকে দোহাই জানায়।

সেদিন মোহনের সব চেয়ে বিস্ময়কর মনে হইয়াছিল, সকলের দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার প্রক্রিয়া। বাজীর ফলাফল টাঙাইয়া দেওয়ামাত্র একটুক্ষণের জন্য হয়তো মুখে প্রত্যাশার জ্যোতি নিভিয়া যায়, তারপর রেস-বুকের পাতা উল্টাইয়া পরের বাজীতে মন দেয়। এত আশা, এত উত্তেজনা যে বাজীটিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তার গুরুত্ব এখন মিথ্যা, ফলাফল অর্থহীন: কোন ঘোড়া জিতিয়াছে কোন ঘোড়া জেতে নাই কি তাতে আসিয়া যায়? এবার যে বাজী আছে তাই নিয়া এখন মাথা ঘামাও।

জীবন যুদ্ধেও কি মানুষ অতীতের হারজিত তুচ্ছ করিয়া ভবিষ্যতে মসগুল হইয়া থাকে না? বন্ধুর সঙ্গে রেস দেখিতে আসিয়া সেদিনও মোহন এই কথা ভাবিয়াছিল। রেসে আধ ঘণ্টা পরে পরে বাজী, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মুখ বিবর্ণ হওয়ার বেশী আপশোষের সময় থাকে না, জীবনে বড় রকম পরাজয় ঘটিলে মানুষ কিছু দিন আপশোষ করার সময় পায়।

এক সময় রেস শেষ হইয়া গেল সেদিনকার মত।

প্রায় সাড়ে সাতশ' টাকা জিতিয়া সন্ধ্যা গর্ব্বে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। রেসে বাজী জেতার এ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হয়তো ভাবপ্রবণতার সম্পর্ক নাই। ভাবপ্রবণতা শুধু হৃদয়ের কারবারে থাকে!

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া শ্রান্ত মোহন জলে ভেজা কাদামাখা মানুষের স্রোতের দিকে চাহিয়া থাকে, পাশে বসিয়া সন্ধ্যা অজস্র কথা বলিয়া যায়! কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু পরিষ্কার করা হইয়াছে তবু কাদামাখা মানুষগুলির চেয়ে নিজের গাড়ীর জন্য মোহনের বেশী মমতা হইতেছিল।

'বাড়ী ফিরবে তো?'

'এখন? বেশ চলো।'

'আমি আর যাব না, বাড়ীতে কাজ আছে।'

সন্ধ্যা জিদ করে, মোহন কিন্তু রাজী হয় না। চিন্ময়ের কথা তার মনে পড়িতেছিল। সারাদিন সন্ধ্যার সঙ্গে কাটিয়াছে, এখন আবার তার সঙ্গে ব্যারাকপুরে ফিরিয়া গিয়া রাত না হোক সন্ধ্যাটা কাটানো উচিত হইবে না।

শেষে সন্ধ্যা প্রায় কাতরভাবে বলে, 'তুমি না গেলে বাড়ী ফিরে একা একা কি করব? সময় কাটবে কি করে? অন্তত কোন একটা সিনেমায় যাই চলো, তারপর বাড়ী ফিরো?'

এমন করুণ শোনায় সন্ধ্যার আবেদন, এমন কাতর মনে হয় তাকে সময়ের

পীড়নে! সময় না কাটার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে তো এভাবে সময়কে কেউ ভয় করিতে পারে না?

একা একা সময় তবে কি কাটে না সন্ধ্যার!

'আমার ওখানে যাবে?'

'আজ থাক।'

যাওয়ার অনেক বাড়ী আছে সন্ধ্যার, বন্ধুর তার অভাব নাই। দু'তিনটা হোটেলের যে কোন একটাতে গেলেই বন্ধু আর বান্ধবীদের সাথে হৈ চৈ করিয়া রাত চারটা বাজাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আজ সে কোথাও যাইতে চায় না, অন্য কারো সঙ্গ কামনা করে না। কারণ মোহন যে আজ সঙ্গে আছে, অনেকদিন পরে সঙ্গে আছে।

তাই তো মানে সন্ধ্যার কথার?

শেষ বেলার সঙ্গে সন্ধ্যার ম্লান রূপের সামঞ্জস্য স্পষ্ট হইয়াছে। শাড়ীর রঙটাও কি বদলাইয়া যাইতেছে সন্ধ্যার?

আকাশে দিনান্তের সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে?

এই অদ্ভুত রকম আধুনিক শাড়ী কিনিতে সন্ধ্যা না জানি কত টাকা আদায় করিয়াছে চিন্ময়ের কাছে।

দিনে সূর্য্যের আলোয় শাড়ীটা এক রকম দেখায়, সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার অন্ধকারকে ঠেকাইবার জন্য বানানো আলো উজ্জ্বল হওয়ায় সঙ্গে বদলাইয়া যায় শাড়ীটার রঙের বৈচিত্র্য!

সন্ধ্যা তাকে একটা সাধারণ বিলাতী হোটেলে নিয়া যায়! দেশী মালিকের বিলাতী হোটেল, বিলাতী হোটেলের মত সহজ জাঁকজমক নাই কিন্তু ঠাট আছে। রেশ খেলায় থার্ড এনক্লোজারে যারা আজ জিতিয়াছে তারা এই হোটেলে ভিড় করিবে। আসল বিলাতী হোটেলে যাইতে তারা অবশ্য কিছুমাত্র ভয় পায় না— রেসে একদিন দাঁও মারিতে পারিলে টাকাগুলি পকেটে নিয়া ওই বিলাতী হোটেলেই তারা যায়—ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়া সগর্ব্বে সগৌরবে বয়কে হুকুম দিয়া পেগ

আনাইয়া পান করে। সায়েবের চেয়েও কড়া গলায় বয়কে ধমক দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বয়ও জানে মানুষটা আজ দরাজ হাতে বখসিস দিবে।

সন্ধ্যা মিষ্টি হাসি হাসে।

'বুঝতে পারছি তোমার ভাল লাগছে না। একেবারে ভুলেই গেছিলাম তুমি গাঁ থেকে আসছ, মেয়ে বন্ধু নিয়ে রেশ খেলা হোটেলে পেগ খাওয়া তোমার পছন্দ নয়।'

'গাঁ থেকে এসেছি বলেই কি—'

'রাগলে? রেগো না। এটুকু তোমার বোঝা উচিত, আমি মোটেই ওভাবে কথা বলছি না, তোমায় খোঁচা দিচ্ছি না। আমি কি বলছি জানো? এতদিন সহর থেকে দূরে ছিলে বলেই বোধ হয় তুমি আমার একমাত্র বন্ধু আছো—খাঁটি বন্ধু আছো।'

মোহন চমৎকৃত হইয়া যায়, অভিভূত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সে একমাত্র বন্ধু—খাঁটি বন্ধু!

সন্ধ্যা ভালবাসায় বিশ্বাস করে না, কিন্তু বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে।

সে ছাড়া সন্ধ্যায় বিশ্বাসী খাঁটি বন্ধু একজনও নাই!

সন্ধ্যা নিজেই একটা প্রস্তাব করে। মোহনকে বাড়ীর সামনে নামাইয়া দিয়া সন্ধ্যা গাড়ী নিয়া ব্যারাকপুর চলিয়া যাইবে, পরদিন গাড়ী ফিরত দিতে আসিবে, লাবণ্যের সঙ্গেও দেখা করিয়া যাইবে।

'তোমার তো লাইসেন্স নেই?'

'তাতে কি? পুলিশ কি ওৎ পেতে আছে?'

চিন্ময়ের মধ্যস্থতা ছাড়াও মোহনের সামাজিক জীবনের পরিধি বাড়িতে লাগিল। চিন্ময় কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল, জগদানন্দ কয়েক-জনের সঙ্গে করাইয়া দিয়াছে, সন্ধ্যা আরও কয়েকজনের সঙ্গে দিল। এই পরিচিতেরা আবার যোগাযোগ ঘটাইয়া দিল নতুন মানুষের সঙ্গে।

নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল হরদম, বাড়ীতেও মানুষের পদার্পণ ঘটিতে লাগিল প্রতিদিন।

একদিন মোহন মস্ত একটা উৎসবের আয়োজন করিল। সেদিন তার বাড়ীর এক গেট দিয়া একত্রিশখানা গাড়ী ঢুকিয়া আরেক গেট দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েদের দামী দামী বিচিত্র সাড়ীতে বাড়ীটা ঝলমল করিতে লাগিল।

পুরুষও নারীর এই ভীড়ের মধ্যে সেদিন মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল চিন্ময় ও সন্ধ্যার।

দেখা যে হইবে দুজনেরি তা জানা ছিল—না জানাইয়া তাদের ডাকিতে মোহনের ভরসা হয় নাই। যারা দুজনের পৃথক বাস করার খবর জানিত তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া সেই যে তারা তফাতে সরিয়া গেল, পরস্পরের দিকে আর তারা চাহিয়াও দেখিল না।

মোহন শুধু বুঝিতে পারিল ওটা তাদের শুধু লোক দেখানো আলাপ নয়, পরস্পরকেও তাদের প্রথমে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল যে বিদ্বেষ তাদের নাই। পরস্পরের মধ্যে তারা বুঝাপড়া করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে, আবার বুঝাপড়া হইলে একদিন কাছে আসিবে।

মোহনের ভয় ও ভাবনার অন্ত ছিল না। দেশে অত সমারোহের সঙ্গে বাপের বার্ষিক কাজ সম্পন্ন করিবার সময়েও তার এতখানি উদ্বেগ জাগে নাই, আজ সহরের শ'খানেক নরনারীকে বাড়ীতে আহ্বান করিয়াই সে একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

দেশে কি ত্রুটিবিচ্যুতির ভয় ছিল না, নিন্দার ভয় ছিল না? দেশের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিত মানুষেরা কি ভাবিবে, কি বলিবে এ চিন্তা কি এতই তুচ্ছ ছিল তার কাছে?

তাই স্বাভাবিক। তারা ছিল নীচের স্তরের মানুষ, আজ মোহনের বাড়ীতে যারা আসিয়াছে তারা উঁচু স্তরের। এই স্তরে উঠিবার চেষ্টা মোহন করিতেছে, ওদের প্রথম বাড়ীতে ডাকিয়া ভয়ে ভাবনায় কাবু হইয়া পড়িবে বৈ কি।

উৎসবের শেষে শুধু জগদানন্দ এবং সন্ধ্যা ছাড়া সকলে হাসিমুখে বিদায় নিয়া চলিয়া গিয়াছে, একটা সিগারেট ধরাইয়া মোহন অসীম গর্ব্ব ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেছে, জগদানন্দ বলিল, 'ত্যাগ, উদারতা, অনুভূতি, আদর্শ এসব কিছু নেই, সব কটা স্বার্থপর, ফাঁকিবাজ কুটিল। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া কিছু বোঝে না, কোন বিষয়ে মাথা ঘামায় না। শুধু বাইরের চাকচিক্য।'

এসব শোনা কথা। ব্যর্থ নিষ্পেষিত আশাহীন দুঃখী মানুষেরা এই সব অভিযোগ করে। কিন্তু কথাগুলি স্বয়ং জগদানন্দের মুখে শুনিতে হওয়ায় মোহনের চমক লাগিয়া গেল।

সন্ধ্যা বলিল, 'সহুরে মানুষ এই রকম হয়।'

'সহুরে মানুষ? সহুরে মানুষ বলে কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষ আছে নাকি? ওদের প্রকৃতিই এই রকম। যেখানে থাক ওদের জীবন কাটাবার মূলনীতিটাই এই রকমই থাকবে, ধরণটা একটু ভিন্ন হতে পারে। সহরের বাইরে ওরা দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, অতটা চোখে পড়ে না। সহরে ওরা দল বাঁধে, নিজেদের সমাজ তৈরী করে আর নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করে বাইরের পালিশটা কার কত চকচকে। লোকে ভাবে দোষটা বুঝি সহরের। সহরে বাস করে বলেই ওরা এ রকম হয়েছে। কিন্তু একটা সহরের লোকের মধ্যে ওরা আর ক'জন! সহরের বেশীর ভাগ লোক সাধারণ, স্বাভাবিক। সহুরে বলতে শুধু ধরা চলে যারা গেঁয়ো মানুষ নয়, যারা গ্রামের বদলে বাস করে সহরে। অন্য রকম মনে করলে সহরের উপর রীতিমত অন্যায় করা হয়।'

সন্ধ্যা হাসিল।

'সহরের নিন্দে আপনার সয় না।'

'কেন সইবে? নিন্দে করার কি আছে সহরের?'

'সহরের জীবন বড় বেশী কৃত্রিম!'

'কৃত্রিম? সহরের জীবন? প্রদীপের বদলে বালব্ জ্বালা, পুকুরের বদলে কলের জল খাওয়া, গরুর গাড়ীর বদলে ট্রামে বাসে চাপা, মেটে খড়ের ঘরের বদলে

পাকা বাড়ীতে থাকা—এসবের জন্য? অথবা সহরে হোটেল রেস্তোরাঁ সিনেমা থিয়েটার আছে বলে? অথবা খেলার মাঠ আলোবাতাস গাছপালার অভাবে শরীর মনের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে—'

সন্ধ্যা বাধা দিয়া একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলে, 'আমি তা বলিনি। ও তর্ক পচে গেছে জানি।'

'শুধু পচে যায় নি, বাতিল করে নর্দ্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য যা কিছু দরকার তা কখনো কৃত্রিম হয় না। কোন একটা সহর তৈরীর দোষ থাকলে সেটা সাধারণভাবে সহরের দোষ বলে ধরা উচিত নয়। সহর যদি নোংরা হয়, সেটা কি সহরের দোষ? ওদিক থেকে তর্ক তুললে আমার রাগ হত, হয়তো ঝগড়াই করে বসতাম আপনার সঙ্গে! কিন্তু সহরের জীবনের তাড়াহুড়োকে কি আপনি কৃত্রিমতা বলেছেন? অথবা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব তুচ্ছ করে সহরের লোকের ফর্সা জামাকাপড় পরে সিনেমা দেখতে যাওয়াকে?'

'না, আমি তাও বলছি না।'

জগদানন্দ হাসিমুখে বলে, 'একথা বললেও রাগ করতাম। পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার মফঃস্বলেই বা কজনে খায়, খেতে পায়? গ্রামে যার নেংটি পরলে ভাল খাবার জোটে, সেও নেংটি পরে না, খাবারের বদলে ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। আপনার কথা বুঝেছি, নিয়মের বিকারকে আপনি কৃত্রিমতা বলছেন। আমিও তাই বলি। কিন্তু সহরের জীবনে সেটা কি গ্রামের চেয়ে বেশী আছে? তাদের সুখদুঃখ হাসিকান্না একই নিয়মে বাঁধা। নেশার আনন্দ আর প্রতিক্রিয়ার বিষাদ তো তাদের দরকার হয় না। জীবনটা ওদের কৃত্রিম মনে হয় কেন জানেন? সহরে জীবনের বৈচিত্র্য ওদের সহজে অবাক হবার ছেলেমানুষীটা নষ্ট করে দেয়। যন্ত্রের বিস্ময়, নানা-ধরনের মানুষ আর তাদের বিচিত্র স্বভাব, বিচিত্র মতিগতির বিস্ময়, খাপছাড়া ঘটনায় বিস্ময় এ সব যায় কেটে। আর সেই সঙ্গে রূপকথার আদর্শ আর নীতিবাদের

স্বাদটা একটু পানসে হয়ে যায়। আলু সিদ্ধর চেয়ে তখন আলুর চপ ভাল লাগে, স্বভাব সুন্দরীর ঘামে আর তেলে ভেজা চকচকে মুখের চেয়ে কলেজ গার্লের পাউডার দেওয়া মুখের লাবণ্য বেশী পছন্দ হয়, বোকার মত আলাপ করার বদলে কথায় কিছু প্যাঁচ আর জটিলতা আনে, দাদামশায়ের ধাঁধাঁর বদলে ক্রসওয়ার্ড পাজল্ সলভ করে আনন্দ পায়।'

তার কথাটাই নিজের পক্ষের যুক্তি হিসাবে কাজে লাগিয়ে সন্ধ্যা বলে, 'তার মানেই তো হৃদয় ওদের একটু শক্ত হয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিকার এলে জীবন কৃত্রিম হয়ে ওঠে না? সহরের লোক যে যার নিজেকে নিয়ে থাকে, কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। পাশাপাশি বাড়ী, এক বাড়ীর লোক জানেও না আরেক বাড়ীর লোকেরা কি করে বেঁচে আছে, কেয়ারও করে না। মড়াকান্না শুনলেও একবার উঁকি মেরে দেখতে যায় না কে মরল। কেবল তাই নয়, বছরের পর বছর ধরে যাদের মধ্যে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা চলেছে তাদের মধ্যেও শুধু থাকে একটা বাইরের সম্পর্ক, বন্ধুত্ব হয় না, হৃদয়ের যোগাযোগ হয় না।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক? হৃদয়হীন স্বার্থপর মানুষ স্বাভাবিক?'

'হৃদয়হীন স্বার্থপর মানুষ নয়। ব্যক্তিগতভাবে একটা মানুষ কজনের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে বলুন তো? সহরে যারা থাকে বছরের পর বছর ধরে কত লোকের সঙ্গে তাদের মেলামেশা করতে হয় ভাবুন তো? সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে হলে হৃদয়ের অবস্থা একটু কাহিল হয়ে পড়বে না? বিশ্বপ্রেমিক সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর সব মানুষকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কজনের জন্য নিজের মনকে কাঁদাবার ক্ষমতা তার আছে? একশ' লোকের সঙ্গে যারা শুধু ভদ্রতার সম্পর্ক রেখে চলে, একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন ওই একশ'জন ছাড়া আরও পাঁচ সাতজন আছে, যারা তার বন্ধু। পাশের বাড়ীতে মড়াকান্না শুনলে যে উঁকি মারতে যায় না, কারো সর্দ্দি হয়েছে শুনলে সেই হয়তো ব্যস্ত হয়ে সহরের আরেক প্রান্তে ছুটে দেখতে যায়! গ্রামের লোকের আরেক

পাড়ার বাড়ীর সঙ্গে পাশের বাড়ীর সম্পর্ক রাখা চলে, কারণ সত্যই হয় তো দুটো বাড়ীর মধ্যে আর একটিও বাড়ী নেই। সহরে পাশের বাড়ীর সঙ্গেও সে সম্পর্ক রাখা চলে না। সহরের পক্ষে সেটাই নিয়ম। মানুষের সময়, ধৈর্য্য, সহানুভূতি কিছুই তো অসীম নয়।'

সন্ধ্যা দমিয়া গিয়াছিল। পরাজয় স্বীকার করার মতই আলগোছে সে বলিল, 'যাই হোক, সহরে পাপ বেশী।'

'কোন হিসাবে পাপ বেশী? সহরে লোকসংখ্যা আর পাপের পরিমান হিসাব করে দেখেছেন?'

'না তা দেখিনি।'

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল।

জগদানন্দ হাসিল না, গভীর আপশোষের সঙ্গে বলিল, 'সহর সম্বন্ধে আপনাদের কত রকমের যে ভুল ধারণা, ভাবলেও দুঃখ হয়।'

নড়িয়া চড়িয়া জগদানন্দ সোজা হইয়া বসে। সহর সম্পর্কে আলোচনায় তার আগ্রহ এবং উৎসাহের আতিশয্য মোহনের বিস্ময়কর মনে হয়। কেবল তর্ক করিয়া নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করা নয়, সহরকে যেন মানুষটা প্রাণ দিয়া ভালবাসে। সহরকে সমর্থন করিয়া ধীরে ধীরে সে নিজের বক্তব্য বলিয়া যায়, রাত্রি যেন গভীর হইয়া আসে নাই, সারাদিনের হাঙ্গামা ও উত্তেজনায় কেউ যেন এতটুকু শ্রান্ত নয়! লিখিত বক্তৃতার মত তার গুছানো কথাগুলি শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় এ বিষয়ে সে কত চিন্তা করিয়াছে।

শুনিতে শুনিতে নিজেকে সত্যই একটু বিপন্ন মনে হয় মোহনের। কতগুলি বিশ্বাস ও ধারণায় তার সুনিশ্চিত নির্ভর ছিল, খেলনা-বেলুনের মত সেগুলিকে এখন মনে হয় ফাঁপা।

লাবণ্যও মন দিয়া শুনিতেছিল। চোখ দু'টি তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু। সেই চোখের দিকে চোখ পড়ায় জগদানন্দ হঠাৎ থামিয়া গেল।

'ইস্, আপনাদের ঘুম পেয়েছে!'

'আপনার পায় নি ?' লাবণ্য আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

প্রশ্নটা ছেলেমানুষী। দশ বছরের মেয়ের মুখে মানাইত। প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে অপরিমান শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিটা অন্য যে কোন মানুষ সম্পর্কে হয় কৃত্রিম নয় বিসদৃশ মনে হইত।

তবে জগদানন্দ এ পরিবারের গুরুদেবের ভাই, এ বাড়ীতে পদার্পণ ঘটিলেই মোহনের মা তাকে প্রণাম করেন। লাবণ্যকে মন্ত্র দেওয়ার জন্য অনুরোধও তিনি জানাইয়া রাখিয়াছেন। জগদানন্দ স্বীকার করে নাই। তবু সে এই পরিবারের গুরুবংশের প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভক্তির বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। তাকে যত খুসী শ্রদ্ধা করা চলে, ছেলেমানুষের মত ছ্যাবলামি করার মত সেটা প্রকাশ করিয়া দেখানোও চলে।

তাই একমাত্র মোহন ছাড়া তার ছেলেমানুষীতে কেহ বিরক্ত হয় না। তার সরলতা সন্ধ্যার ভালই লাগে।

আজ রাতটা সন্ধ্যা এখানেই থাকিবে।

আগে কিছুই ঠিক ছিল না, সকলের বিদায় নেওয়ার আগে। মোহন জানিত সন্ধ্যা গাড়ীতে আসিয়াছে, গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। বিদায় নেওয়ার সময় আসিলে সন্ধ্যা বলিয়াছিল, 'বেশী খাওয়া হয়ে গেছে মোহন।'

'খারাপ লাগছে ?'

'ভারি খারাপ লাগছে।'

'তাই তো।'

'গাড়ীর ঝাঁকুনিতে যদি—?'

'তাই তো।'

'থাক, আজ রাতে আর যাব না। গাড়ী ফিরে যাক। সকালে বরং ট্রেণেই ফিরে যাব। সকাল ছ'টা পর্য্যন্ত বাবা আমাকে গাড়ী ধার দিয়েছে, ফিরতে দেরী হলে চটবে।'

'আমার গাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসব'খন।'

সন্ধ্যা হাসে।

'মুখ ফুটে একটু বলো এসব কথা নিজে থেকে! স্ন্যাতে এখানে থাকবার কথাটা তো যেচে বলতে হল আমাকে। তোমার মুখে খালি শুনলাম, তাইতো! তাইতো! যেচে যেচে তোমার কাছে সব আদায় করতে হবে নাকি?'

ড্রাইভারকে ডাকিতে পাঠাইয়া সন্ধ্যা বলিয়াছিল, 'মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল যে তোমার? কি হল? অসুবিধে হয় যদি তো খোলাখুলি সেটা বলো, ওর কাছেই নয় আজ রাতটা কাটাই গিয়ে। বাড়ী কাছেই আছে, এটুকু যেতে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে বমি আসবে না।'

'যেচে যাবে?'

সন্ধ্যা সুখের হাসি হাসিয়াছিল।

'যেচে? যাবার সময় অত করে সঙ্গে যেতে বলছিল, ছেলেমানুষের মত সাধাসাধি করছিল, চেয়ে ছাখো নি?'

মোহন চাহিয়া দেখিয়াছিল এবং দৃশ্যটা ভুলিতে পারিতেছিল না। সন্ধ্যাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্মই তবে এতখানি ব্যগ্রভাবে কথা বলিতে দেখা গিয়াছিল চিন্ময়ের? মাঝে মাঝে চিন্ময়কে আজ সে অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সঙ্গে যাইতে বলা হয় তো সেই দেখারই পরিণতি। না বলিয়া থাকিতে পারে নাই।

'গেলে না কেন!'

'কেন যাব? আমায় দেখতে দেখতে একজনের মোহ জাগবে, আর সে ডাকা মাত্র লক্ষী মেয়ের মত তার সঙ্গে চলে যাব? আমি মানুষ নই?'

সন্ধ্যা গলা নামাইয়া প্রায় ফিস ফিস করিয়া বলিয়াছিল, 'তাছাড়া আজ এখানে থাকব। তোমার বাড়ীতে-রাত কাটানোর সুযোগ তো রোজ মেলে না।'

তারপর জোরে ঢোঁক গিলিয়া বলিয়াছিল, 'আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগছে না মোহন।'

'তা হলে আর দেরী না করে শুয়ে পড়। একা ঘরে ভয় করবে না তো? তা হলে মেয়েরা কেউ বরং—'

সন্ধ্যা ক্লিষ্ট মুখে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল; 'ভয় করবে? একটা ঘরে রোজ একলা শুই জান না?'

'সেটা তোমার নিজের বাড়ী।'

'এটা বুঝি পরের বাড়ী? আমি বুঝি পরের বাড়ীতে রাত কাটাই? তুমি অবশ্য আমাকে পর ভাব—'

সন্ধ্যা চেষ্টা করিয়া আবার একটু হাসিয়াছিল।

মোহন তখন ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই কথার পর্ব্ব শেষ করিয়া দিল। ঘুমে কাতর লাবণ্যের উপর সন্ধ্যাকে শোয়ানোর ব্যবস্থা করার ভার ছাড়িয়া দিয়া বসিবার ঘরে চলিয়া গেল।

ঘুমে লাবণ্যের চোখ মেলিয়া রাখিতে কষ্ট হইতেছিল। কোন রকমে সন্ধ্যাকে তার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া সে শুধু বলিল, 'দরকার হলেই আমাদের ডাকবেন। আমরা পাশের ঘরেই আছি।''

তারপর কোন রকমে শ্বশুর শাশুড়ী শুইয়াছেন কিনা খবরটা নিয়াই নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় গা এলাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘরে ঘরে আলো নিভিয়া তারপর এক সময় সারা বাড়ীটা হইয়া গেল নীরব ও অন্ধকার, আলো শুধু দেখা গেল উপরে মোহনের নিজস্ব বসিবার ঘরে ও নীচে গ্যারেজে শ্রীপতির ঘরে।

একজনের গৃহে এবং আরেকজনের বাহিরে সঞ্চয় করা শ্রান্তিতে ঘুম টুটিয়া গিয়াছে।

শ্রীপতির ঘুম আসিতে আরও আধঘণ্টা সময় লাগিল। মোহনের তখনও ঘুম আসিল না।

তার শুধু শ্রান্তি নয়। তার বাড়ীতে তার আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া যাচিয়া সন্ধ্যা এই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে, কয়েক পা হাঁটিয়া ভেজানো দরজাটি ঠেলিয়া তার কাছে

যাওয়ার সুযোগ! একথা ভাবিতে মোহনের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে, এও যে জগতে সম্ভব হয় বিশ্বাস করিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ জীবনটা হইয়া যাইতেছে বিস্বাদ।

না, ও ঘরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নাই।

এই অক্ষমতাকে স্বীকার না করিলে আজ এত রাত্রের বর্ত্তমান জীবনের কোন অর্থ হয় না।

ফাঁকা ঘরে একা শুইয়া সন্ধ্যার ঘুম আসিয়াছে কিনা কে জানে। সন্ধ্যা যে বলিয়াছিল তার কিছুই ভাল লাগিতেছে না সেটা কিন্তু ছলনা নয়। কথার পর্ব্ব শেষ করিয়া সন্ধ্যাকে বিছানায় আশ্রয় নিতে দেওয়ার প্রয়োজনটা খেয়াল হওয়া মাত্র মোহন সেটা টের পাইয়াছিল।

বেশী খাওয়ার জন্যই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক, সন্ধ্যার খুবই খারাপ লাগিতেছিল—দেহ এবং মন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্মার্ট থাকিতেই হইবে সন্ধ্যাকে—কথায় হারিয়া যাওয়া তার স্বভাব নয়।

জগদানন্দের সঙ্গে তর্কে সে হার মানে নাই, এমনভাবে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া তর্ক শেষ করিয়াছিল যেন তার মোট কথাটা জগদানন্দ মানিয়া নিয়াছে, খুঁটিনাটি নিয়া আর তর্ক করিয়া লাভ নাই।

সন্ধ্যার স্বাস্থ্য সত্যই ভাল নয়। সত্যই তার গা বমি বমি করিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

তবু যে আজ সে অভিসারিকার ভূমিকা অভিনয় করিতেছে তার মধ্যেও এতটুকু ফাঁকি দেয় নাই। তার উপায় নাই ফাঁকি দেওয়ার।

মোহনকে জয় না করিতে পারিলে নিজে সে মিথ্যা হইয়া যাইবে।

চিন্ময়ের কাছে হার মানিবে।

সন্ধ্যার বদলে সে নিজে যদি এই সুযোগটা সৃষ্টি করিত! কত পৃথক হইয়া যাইত ঘুমন্ত জগতে চুপি চুপি তার সন্ধ্যার কাছে যাওয়া। একদিন সত্যই সে এমনি অভিসারের আয়োজন করিত। সন্ধ্যার বাড়ীতে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে আর হোটেলে

যে দিনটা সন্ধ্যার সঙ্গে কাটিয়াছিল, সেই দিনই সে জানিয়াছিল সহরে বাস করিতে আসিয়া এই একটি অনিবার্য সম্ভাবনা সে জীবনে টানিয়া আনিয়াছে।

নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে একদিন হার মানার কল্পনায় তাঁর ফাঁকি ছিল না। এটুকু জানা না থাকিলে সন্ধ্যার ধৈর্যের অভাবটা হয়তো তার এত খারাপ লাগিত না।

এটা সন্ধ্যার উচিত হয় নাই।

জীবন সস্তা হইয়া যাওয়ার দুঃখে অভিভূত মোহন হয়তো আরও দু'এক ঘণ্টা তার নিজস্ব সেই বসিবার ঘরেই কাটাইয়া দিত। হঠাৎ আরও ভয়ঙ্কর একটা ভাবনা মনে আসিয়া তাকে ঝাঁকি দিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিল।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে সন্ধ্যা যদি ধৈর্য্য হারায়? নিজে যদি সে এ ঘরে তার কাছে চলিয়া আসে?

তাড়াতাড়ি মোহন টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা টিপিয়া দেয়। দুইটি ঘরের রুদ্ধ দুয়ার পার হইয়া সন্ধ্যার ঘরের দরজায় হাত রাখিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। সন্ধ্যার দুয়ার ভেজানো নয়। ভিতর হইতে দরজাটি সে বন্ধ করিয়াছে! সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই গভীর আরামে চোখে জল আসার মত তাড়াতাড়ি মোহনের চোখে ঘুম আসে।

ছয়

সকালে সকলে দেরী করিয়া ওঠে।

সবচেয়ে বেলা হয় লাবণ্য; সন্ধ্যা আর নগেনের। আধ ঘণ্টার মধ্যেই লাবণ্য আবার ফিরিয়া যায় বিছানায়। তার বিবর্ণ মুখ দেখিয়াই বুঝা যায় আজ এবং হয়তো কালও সে বিছানা ছাড়িবে না।

মোহনকে ডাকিয়া সে করুণ স্বরে বলে, 'বড় ডাক্তার ডাকবে বলেছিলে যে? ডাকো না?'

'তিনজনকে তো দেখালে। আর কত বড় ডাক্তার দেখাবে?'

'আরও বড় ডাক্তার—সব চেয়ে বড়। মরে গেলে তো আর দেখাতে হবে না।'

'আচ্ছা ওবেলা ডাকব।'

'ওবেলা নয়, এখুনি।'

'সন্ধ্যাকে পৌঁছে দিয়ে আসি? ডাক্তার এসেই তো তোমার কষ্ট কমিয়ে দিতে পারবে না।'

'পারবে। সন্ধ্যাকে ড্রাইবার পৌঁছে দিয়ে আসুক। তুমি আমার কাছে থাকো।'

'বারটা একটার মধ্যে ফিরে আসব লাবু।'

'না না, তুমি যেওনা। তুমি কাছে না থাকলে সইতে না পেরে আমি হয়তো গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে যাব।'

লাবণ্য অনেক খাপছাড়া কথা বলে, আজকের কথাটা অদ্ভুত রকমের মৌলিক। তবে তার কথার মানে খুব পরিষ্কার। অন্ততঃ তাই মনে হয় মোহনের।

'সন্ধ্যাকে আমি নিজে পৌঁছে দিতে না গেলেই তোমার অসুখ কমে যাবে বলছ তো লাবু?'

লাবণ্য অবাক হইয়া মোহনের দিকে তাকায়। তার সেই খাঁটি বিস্ময়ের মধ্যে নিজের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফাঁকিটা মোহন যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।

সন্ধ্যার কথা লাবণ্যের মনেও আসে নাই। যন্ত্রনা তার সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, জগতে তার একমাত্র আপনার জনটিকে তাই সে কাছে রাখিতে চায়। সন্ধ্যাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার বদলে তাকে কাছে থাকিতে বলার আর কোন কারণ নাই।

নিজের একটা অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে রাগে মোহনের মন জ্বালা করিতে থাকে।

আরেকটি ভেজানো দরজা খুলিতে গিয়া সে যেন বাধা পাইয়াছে। লাবণ্যের কষ্ট দেখিয়া তার মায়া হইত নিশ্চয়, এখন আর কারও জন্য মায়া মমতা কিছুই মাথা তুলিতে পারে না। লাবণ্যকে একটা বড়ি খাইতে দিয়া নিজে সে নীচে চলিয়া যায়, পাঠাইয়া দেয় নলিনীকে।

সকালে ঝরণা আসে।

কাল রাত্রে দাদার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেও বুঝি কিছু টের পাইয়াছিল, সকালে উঠিয়াই সে সন্ধ্যার বাড়ীতে ফোন করিয়াছিল। সকালে সন্ধ্যা এখন কোথায় আছে তার বাড়ীর লোক বলিতে পারে নাই, শুধু জানাইয়াছে যে সে কাল সন্ধ্যায় মোহনের বাড়ী নিমন্ত্রন রাখিতে বাহির হইয়াছিল।

ঝরণারও নিমন্ত্রন ছিল। সে অভিমান করিয়া আসে নাই।

অভিমানের কারণ, মোহন নিমন্ত্রণ করিতে গেলে তাকে সে নগেনকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিল। কিন্তু নগেন যায় নাই।

কিন্তু দাদার সমস্যা অভিমানের চেয়ে বড়।

সন্ধ্যা এখানে আছে অনুমান করিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

মোহন যখন কাছে আসিল, বৌদির সঙ্গে ঝরণার বুঝাপড়াটা সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে, রাগে দুঃখে অভিমানে ঝরণা কাঁদ কাঁদ এবং মুখখানা ভার লাল।

'না এলে তুমি, না এলে। তুমি যা খুসী করবে, আমরা চিরকাল সয়ে যাব ভেবেছ? দু'মাসের মধ্যে দাদার যদি না আবার আমি বিয়ে দিই—'

'আমি বেঁচে থাকতে? মরে যাওয়ার পরেও পারবে না ভাই, বড্ড বেশী রকম খাঁটি তোমার দাদার ভালবাসা।'

'মরাই ভাল তোমার। তুমি মর।'

মোহনকে ঝরণা দেখতে পায় নাই, দৃষ্টিটা সন্ধ্যার ম্লান মুখেই আটকানো ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষার মত একটা মুখভঙ্গি করিয়া সে ভিন্ন স্বরে বলিতে থাকে. 'দাদার আমি বিয়ে দেব, দেখো তুমি। এমনি না পারি, আমার বন্ধুকে দিয়ে দাদাকে নষ্ট করাবো। তখন তো বিয়ে না করে পারবে না।'

এবার ঝরণার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার সঙ্গে তেজও বোধ হয় তার ঝিমাইয়া যায়, ধপ করিয়া সে বসিয়া পড়ে একটা চেয়ারে।

সন্ধ্যা বাহির হইয়া গেলে মোহনও কলের মত তার সঙ্গে যায়। সন্ধ্যাকে গাড়ীতে বসাইয়া সে কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসে।

কাঁদিতে দেখিয়াও ঝরণার সঙ্গে সে একটি কথা বলে নাই, নিজের এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করা তার অসম্ভব মনে হয়। ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিতে পায় ঝরণার কান্না থামিয়াছে এবং ইতিমধ্যে কোথা হইতে নগেন আসিয়া তার কাছে কাঠের পুতুলের মত বসিয়া আছে।

নগেনের মুখ সজল মেঘের মত গম্ভীর।

ঝরণাই আগে কথা বলে।

'বৌদির জন্য দেখলেন?' মুখ তুলিয়া সে লজ্জার হাসি হাসে, 'আমিও যেমন, গায়ে পড়ে পায়ে ধরে বৌদিকে সাধতে আসি। এই নিয়ে এগারো বারো বার সাধাসাধি করলাম।'

'সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে ঝরণা।'

ঝরণা সজোরে মাথা নাড়ে।—'আপনি জানেন না। ওর মত নিষ্ঠুর মেয়ে জগতে নেই।'

'নিষ্ঠুর নয়, খেয়ালী বলতে পার।'

'নিষ্ঠুর আর খামখেয়ালী, দুই-ই। মেয়েমানুষ খামখেয়ালী হলেই একদম বিগ্‌ড়ে যায়।'

সহরে মেয়ের মুখে এমন কথা? কলজে ডিঙ্গানো এই বয়সের মেয়ের মুখে, স্বাধীন মেয়ের মুখে?

মোহন কিন্তু বুঝিতে পারে। এসব চিন্ময়ের গ্রামকে অস্বাভাবিক রকম ভালবাসার সকর্মক প্রভাবের পরিচয়।

নগেনের জন্য মোহন অস্বস্তি বোধ করিতে ছিল। এসব কথার ভাঙ্গাচোরা দু'চারটি টুকরাও ওর কানে যাওয়া উচিত নয়, বয়স্ক মানুষের জীবনে এসব জটিল সমস্যার অস্তিত্বই ওর অজানা থাকা উচিত। বড় জোর দু'টি একটি সিগারেট খাওয়ার অনুমতি ওকে দেওয়া যায়, এসব অভিজ্ঞতার ছোঁয়াচ লাগার বয়স এখনও ওর হয় নাই।

কে জানে কি বলিতে ঝরণা কি বলিয়া ফেলিবে, মোহন তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল।

গাড়ীতে মোহন বলিল, 'ফিরে যাও না সন্ধ্যা?'

'না আমার সহ্য হয় না।'

সুন্দর সুদীর্ঘ পথ সামনে হইতে পিছনে সরিয়া যায়, মোহনের মনে হইতে থাকে হঠাৎ পা পিছলাইয়া সে যেন আছাড় খাইবে। গাড়ীর চাকা নয়, পা। পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটার মত পেশীতে টান ধরিয়া শরীরটা যেমন শক্ত হয়, মনটা যেমন থ বনিয়া থাকে, ঠিক সেই রকম অনুভূতি।

'চিন্ময় তোমায় ভালবাসে মনে হয়।'

'তুমিও তো আমায় ভালবাসো?'

'না, তোমার জন্য আমার একটা মোহ আছে সত্যি, কিন্তু আমি জানি সেটা ভালবাসা নয়। দশজনকে সমাজকে না মেনে ভালোবাসা হতেই পারে না। জীবনের আর সব তুচ্ছ করে দু'চারদিনের পাগল হওয়ার ঝোঁকটা কি ভালবাসা? জগৎ সংসার ভুলে গেলাম, সব মানুষের ভালবাসার অধিকার আছে ভুলে গেলাম, সারাটা জীবনের কথা ভুলে গেলাম। জীবন্ত মেয়ে পুরুষের মধ্যেই ভালবাসা হওয়া সম্ভব—জীবনের হিসাব ছাড়া কি ভালবাসা হয়? কাল রাত্রে তোমার ঘরের দরজায় গিয়েছিলাম জানো? দরজা ঠেলেছিলাম?'

'জানি বৈকি। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি টোকা দিলেই ছিটকিনি খুলে দিতাম।'

'তুমি জানো আমি তোমায় ভালবাসি না। তাই ছিটকিনিটা খুলে রাখতে ভরসা পাওনি। গাঁ থেকে সহরে এসেছে মানুষটা, যদি না বুঝতে পারে ছিটকিনি খোলা রাখার মানে? ভালবাসার খেলা মিটে যাওয়ার পরেও যদি একনিষ্ঠতা দেখিয়ে আর দাবী করে মুস্কিলে ফেলে?'

সন্ধ্যা খানিক চুপ করিয়া থাকে।

'উপদেশ দিচ্ছ? স্নেহ কর বলে?

'না। আমার মনে হয় চিন্ময় তোমাকে ভালবাসে।'

'না পেলে ভালবাসে। ফিরে গেলে কি হবে জানো? পনের দিন একমাস আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। তারপর ঘণ্টাখানেক আমায় পেলেই যথেষ্ট। রাত এগারোটায় ঘরে আসবে, একটা সিগারেট ধরিয়ে এক দৃষ্টিতে আমায় দেখবে, সিগারেটটা শেষ করে বুনো জানোয়ারের শিকার ধরার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে বিছানায়। বারোটার সময় নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে।—'

সন্ধ্যা মাথা নাড়ে—'ভুল বললাম। ঘুমোবার সময় নাক ওর ডাকে না'।

'এইজন্য যাও না? আমি ভাবছিলাম, ছেলেমেয়ের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের গণ্ডগোল চলছে।'

'ছেলেমেয়ের ব্যাপার? মাথা খারাপ নাকি তোমার?'

সন্ধ্যা পথের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। মোহনের অজ্ঞাতেই গাড়ীর গতি বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ সন্ধ্যার অস্ফুট কাতরোক্তি তার কানে গেল, "আস্তে চালাও না একটু! মাগো, একটু আস্তে চালাও। সবাই কি সমান তোমরা?'

গাড়ীর গতি শ্লথ হইয়া আসিলে সে যেন আরাম বোধ করিল, ভাল করিয়া হেলান দিয়া বসিয়া দু'আঙ্গুলে আলগোছে মোহনের বহুমূল চাপিয়া ধরিল।—'মেয়েদের মেয়ে বন্ধু থাকে, আমার বন্ধু পুরুষ,—তুমি। আমাকে তোমার খাপছাড়া মনে হত, ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারতে না—এখনো খাপছাড়া লাগে। তার কারণ, তোমার সঙ্গে আমি ঠিক বন্ধুর মত ব্যবহার করতাম। তুমি না থাকায় ক'বছর বড় কষ্ট পেয়েছি মোহন। এমন একলা মনে হ'ত নিজেকে কি বলব।'

মোহন মুখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, 'না না, তুমি চুপ করে থাকো। আমায় কথা বলতে দাও।'

তবু মোহন বলে, 'তোমায় একখানা চিঠি লিখেছিলাম!'

'মনে আছে, 'জবাব দিইনি। চিঠি! মনের বোঝা কমাতে রোজ যার সঙ্গে কথা বলা দরকার, তার সঙ্গে চিঠি লেখালিখি করে কি হত?—জানো মোহন, আসলে আমি চিরদিন খুব ভীরু আর শান্ত ছিলাম? তুমি ভাবতে সন্ধ্যা বুঝি খুব তেজী একগুঁয়ে স্মার্ট মেয়ে, কিন্তু ভেতরে সত্যি আমি খুব ঠাণ্ডা ছিলাম। আর দশটি মেয়ের সঙ্গে তাদের মত চলতাম, শুধু নকল করতাম। কোনদিন কোন বিষয়ে কাউকে ছাড়িয়ে যাইনি। জানো, তুমি ছাড়া কোন ছেলে আমাকে কোনদিন একলা বেড়াতে পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে নি? দু'চার জন মেয়ে কাছে থাকলে বুক ফুলিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতাম, এমন ভাব দেখাতাম যেন আমার অসাধ্য কাজ নেই। কেউ না থাকলেই আমার বুক ঢুব্ ঢুব্ করত। এখন আমি যার-তার সঙ্গে রাত বাঁরোটা পর্য্যন্ত বাইরে কাটিয়ে দিই, হোটেলে বসে কক্‌টেল খাই। কেন জানো? ওঁর ভীষণ ভালবাসা সইতে পারি না বলে। তবে—'

ভীষণ ভালবাসা! চিন্ময়ের মতিগতি ভাল করিয়া জানা না থাকিলে মোহনও হয় তো ভীষণ ভালবাসার মানে বুঝিয়া নিত কড়া ভালবাসা, দুর্দ্দান্ত ভালবাসা। সন্ধ্যা কি অর্থে 'ভীষণ' বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে মোহন বুঝিতে পারে। চিন্ময়ের ভালবাসা শুধু কড়া বা দুর্দ্দান্ত নয়—কোমলও বটে, এদিকে আবার বড় বেশী গভীর, বড় বেশী সজাগ।

সন্ধ্যার জন্য নিজের প্রেম সম্পর্কে সে যেন চব্বিশ ঘণ্টা সচেতন হইয়া থাকে, সন্ধ্যাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিবার সুযোগ দেয় না যে সে তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে!

সন্ধ্যাও তাই বলে। বলে, 'একেই তো মানুষটা সব বিষয়ে সিরিয়াস্—ভালবাসা পর্য্যন্ত অত সিরিয়াস হলে মানুষের সয়? তবে—।

'তবে?'

'তুমি থাকলে এরকম হত না। আমি ঠাণ্ডাই থাকতাম। আমার কেউ ছিল না মোহন।'

'তুমি বেশ ঠাণ্ডা লক্ষী মেয়েই আছ সন্ধ্যা।'

বেলা দেড়টার সময় বাড়ী ফিরিয়া জগদানন্দকে লাবণ্যের ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মোহন আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কলিকাতার সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে নামকরা ডাক্তারকে আনার জন্য নগেনকে লাবণ্য জগদানন্দের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

জগদানন্দ নিজেই ডাক্তারকে সঙ্গে আনিয়াছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া এইমাত্র ডাক্তার বিদায় হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যেই লাবণ্য একটু ভাল বোধ করিতেছে।

'তুমি তো চলে গেলে আমায় ফেলে, আমার এমন ভয় করতে লাগল, যদি মরে যাই? উনি বলছেন সেরে যাব।'

'কে, ডাক্তারবাবু?'

'না, উনি।'

মোহন অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে, বিরক্তও হয়। লাবণ্যের কাণ্ডজ্ঞান নাই, লজ্জাসরম নাই। একি তার জ্বর হইয়াছে যে বাহিরের লোককে ঘরে বসাইয়া অসুখের কথা আলোচনা করিতেছে? মেয়েলি অসুখের অশ্লীল বিজ্ঞাপন রচনার পরামর্শ-সভা যেন বসিয়াছে তার অন্দরে তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করিয়া। দু'কান মোহনের ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে।

গুরুদেবের ভাই বলিয়া জগদানন্দ যে তার মায়েরও প্রণম্য, লাবণ্যের সঙ্গে তার যে পিতার মত সম্পর্ক, এটা মোহনের খেয়াল থাকে না।

জগদানন্দ বলে, 'ডক্টর উপেন সাকে এনেছিলাম। আমার বাড়ীতেও উনি চিকিৎসা করেন।'

জগদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমি তবে যাই এবার?'

লাবণ্য বলিল, 'হ্যাঁ, আসুন। অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, আপনার বোধ হয় খাওয়াও হয়নি।'

খাওয়া মোহনেরও হয় নাই।

কিন্তু লাবণ্য যে তার খাওয়ার কথা উল্লেখ করে না, সেটা অন্যায় নয়। সন্ধ্যাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিতে গিয়া সে বাড়ী ফিরিয়াছে বেলা দেড়টায়—তারা কি করিয়া ভাবিবে যে সন্ধ্যা তাকে খাইতে না দিয়া বিদায় করিয়াছে?

লাবণ্যের সকাতর আবদার উপেক্ষা করিয়া সে সন্ধ্যাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যা স্নানাহার না করিয়া তাকে আসিতে দেয় নাই বলিয়াই তো ফিরিতে তার এত বেলা হইয়াছে।

এসব মোহন বোঝে। খিদেয় তার পেট জ্বলিয়া যাওয়ার জন্য সন্ধ্যা যে দায়ী নয়, এরা তা কেমন করিয়া জানিবে।

সন্ধ্যাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার খানিক পরেই সে বিদায় নিয়াছিল। এতক্ষণ শুধু সহরের রাস্তায় রাস্তায় পাক দিয়া বেড়াইয়াছে।

কেনা কাটা সারিয়া তার বাপের যেমন একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল পায়ে হাঁটিয়া সহরের পথে ঘুরিয়া বেড়ানোর—বিষন্ন হাসি বিনিময় করিয়া সন্ধ্যার কাছে বিদায় নিবার পর তারও তেমনি একটা অদম্য ঝোঁক চাপিয়াছিল গাড়ী চালাইয়া সহরটা চষিয়া বেড়ানোর।

সহরের পথে হাঁটিবার ঝোঁকে তার বাবা মরিয়াছিল দুর্ঘটনায়।

কয়েকটা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা হইতে সে অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে।

বিলাতী দোতলা বাসের রোগা কালো মাঝবয়সী বাঙালী ড্রাইভার কী ভাবে ব্রেক করিয়া অ্যাক্সিডেণ্ট ঠেকাইয়াছিল! শুধু আধ হাত—অতবড় দোতলা বাসটার গতি রুধিতে আর আধ হাত বেশী আগাইতে হইলে মোহনও হয় তো আজ পিতার পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বর্গে যাইত।

ঘণ্টা তিনেক সে অকারণে চক্র দিয়াছে, তেল ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং পকেটে টাকা না থাকায় দামী হাত ঘড়িটা জমা দিয়া তেল কিনিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। এসব বাড়ীর লোকের জানিবার কথা নয়।

তবু মোহনের বুকে অভিমান উথলাইয়া উঠে।

একবার কি জিজ্ঞাসা করিতে নাই : তুমি খাইয়া আসিয়াছ কি ?

দেশে থাকিতে সকালে আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া বেলা তিনটায় ফিরিলেও তো লাবণ্য এবং মা ছাড়াও বাড়ীর তিনচার জন মানুষ জিজ্ঞাসা করিত, খেয়ে এসেছো ?

তার খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বাড়ীর মানুষ উদাসীন হইয়া গিয়াছে।

লাবণ্য এবং মা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় না যে সত্যই সে খাইয়া আসিয়াছে।

জগদানন্দ বিদায় নেওয়া মাত্র মোহন বাড়ীর মানুষের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধাইয়া দেয়।

স্নানের ব্যবস্থায় সামান্য ত্রুটির জন্য জ্যোতিকে ধমকায়, মাছ না থাকায় শুধু ডাল তরকারী এবং তাড়াতাড়ি মোড়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনা দই মিষ্টি দিয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিতে হওয়ায় গর্জ্জন করিয়া ওঠে।

মা গিয়াছিলেন দামী গরদের শাড়ী পরিয়া সহরের পাড়া বেড়াইতে। আরও ঘণ্টাখানেক পাড়া বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া গরদের কাপড় ছাড়িয়া থান ধুতি পরিয়া তিনি একটু শুইতেন।

মোহনের পরিত্যক্ত ধুতি পরা আশ্রিতা মঙ্গলা তাঁকে ডাকিয়া আনিল। জানাইল, মোহন বাড়ী ফিরিয়া পাগলের মত করিতেছে, লাথি মারিয়া সকলকে দূর করিয়া দিবার কথা বলিতেছে।

গরদের শাড়ী ছাড়িয়া থান ধুতি পরিতে পরিতে মা মোহনের গর্জ্জন আর ধমকানি শুনিলেন। তারপর ছেলের সামনে গিয়া শান্ত সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, 'তুই নিজেই একটা হুকুম দিবি, বাড়ীর লোক তোর হুকুম মত কাজ করলে নিজেই আবার রাগারাগি করবি? এ কোন দেশী বুদ্ধি বিবেচনা মেজাজ হয়েছে তোর?'

'কি হুকুম দিয়েছিলাম?

'তোর মনে থাকে না বলেই তো মুস্কিল। এই সেদিন বেলা দুপুর করে বাড়ী ফিরলি, তোর জন্য উনান জ্বলছে, মাছটাছ সব রাখা হয়েছে দেখে যেন ক্ষেপে গেলি একেবারে। মনে নেই? সবাইকে ডেকে ঢালাও হুকুম দিলি, বারটার মধ্যে উনান নেবাতে হবে, খাওয়া দাওয়া সারতে হবে? বারটার পর তোর জন্য কিছু রাখতে হবে না, তুই বাইরে থেকে খেয়ে আসবি।

মিষ্টতা পরিহার করিয়া হঠাৎ যেন রাগিয়া টং হইয়া যান মা।

'বাইরে খেয়ে খেয়ে কী চেহারাই করেছিস। দেখলে মনে হয় যেন বাড়ীতে মা বৌ ভাই বোন মাসীপিসী নেই, খেতে দেবার যত্ন করার কেউ নেই। সহরে এসে এমনভাবে তুই অধঃপাতে যাবি—'

কথা শেষ না করিয়াই মা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। এ যে তাঁর রাগ নয়, এতবড় ছেলেকে ধমক দেওয়া নয়, এ শুধু মায়ের অভিমানের তিরস্কার—ও ছেলে কি আর তা বুঝিবে!

মোহন খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া যাইবার কথা ভাবিতেছিল। মা চলিয়া যাওয়ায় সে আবার খাইতে আরম্ভ করিল।

সত্যই তার মনে ছিল না কবে ঝেঁাকের মাথায় অপচয় কমাইবার জন্য সে হুকুম দিয়াছিল—তার জন্যও বেলা বারটার পর উনান জ্বলিবে না, বাড়ী না থাকিলে তার জন্য বিশেষ পদ কটা রাঁধাও হইবে না।

মাঝে মাঝে চেনা লোকের বাড়ীতে এবং প্রায়ই সে হোটেলে খাইয়া আসে।

স্নানাহারের পর বিছানায় চিৎ হইয়া মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া তার ঘুম পাইতেছে, মা ঘরে আসিলেন।

'কত খরচ হল রে কাল ?'

'জানি না।'

'জানি না বললে কি চলে মনু ? একটু হিসেব করে খরচ করিস বাবা। শুধু খরচ করে যাওয়ার মত টাকা কি আমাদের আছে ?'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।'

'ব্যাঙ্কে আর টাকা নেই ?'

'আছে।'

'কাগজ ভাঙালি কেন তবে হাজার টাকার ?'

মোহন বিছানায় উঠিয়া বসিল।—'তোমার এত টাকার চিন্তা কেন বলত মা ?'

মাও বসিলেন।

তাঁর মুখ শুধু ম্লান নয়, গম্ভীরও বটে। বেশ বুঝা যায় ছেলের রাগ ও বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন।

'তুই ওনার মত একটু হিসেবী হলে চিন্তা হত না মনু।'

'হিসেব আমার আছে। প্রথমটা খরচ একটু বেশী হয়, কত জিনিষ-পত্র কিনলাম—'

'অত দামী সব জিনিষ কেনার কি দরকার ছিল তোর ? বেশ, কেনা-কাটায় যা যাবার নয় গেল, এমনি যে টাকা যাচ্ছে জলের মত ? মাস মাস তিনশ'

টাকা বাড়ী ভাড়া! আমি কি জানি এত ভাড়া এ বাড়ীর, দু'রাত ঘুম হয়নি শুনে। তারপর দুটো চাকর, একটা ঝি, ঠাকুর, ড্রাইভার—'

'কি হয়েছে তাতে?'

'অমন চোখ পাকিয়ে কথা বলিস নে মনু। উনি যেতে না যেতে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার সুরু করেছিস তুই—'

না, মার চোখে জল আসে নাই, সুরটা কান্নার নয়। এও তার একটা নালিশ। একটা জোরালো প্রতিবাদ।

মা যে তার এমন শক্ত মানুষ, এমন সতেজে তার সঙ্গে কথা বলিতে পারেন, মোহনের সে ধারণা ছিল না। জোর করিয়া সহরে টানিয়া আনায় মার রাগ হইয়াছিল, সে রাগ আর কিছুতেই কমিল না।

মোহন বিশ্বাস করে, মার আসল জ্বালা সেইখানে, টাকা খরচ হওয়াটা বড় কথা নয়। অন্যভাবে সে যদি আরও বেশী অপব্যয় করিত, দেশে থাকিয়া ধর্ম্মেকর্ম্মে, আশ্রিত-পোষণে, দেশের আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ উৎসবে—মা খুশী হইতেন।

বহুদিন হইতে মার মনে বোধ হয় এই সাধটা লুকানো ছিল। কৃপণ স্বামীর মৃত্যুর পর বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন, ছেলে এবার তাঁর সাধটা মিটাইবে। বিলাস ও বাহুল্য আসিল, দশজনকে লইয়া আনন্দ ও উৎসব সুরু হইল—কিন্তু সুরু হইল ভিন্ন একটা জগতে। নিজের জগৎ হইতে ছেলে তাঁকে এখানে ছিনাইয়া আনিয়াছে! এখানে তাঁর জল লাগে না মোটেই, এখানে কিছুই তাঁর মনের মত নয়।

তাঁর মন পড়িয়া আছে দেশে।

এ সব মোহন মোটামুটি বুঝিতে পারে। কেবল বুঝিতে পারে না মার চোখের জলের অভাবটা।

মার শুধু সমালোচনা, তর্ক আর নালিশ, সারাদিন গজর-গজর করা। কোমর বাঁধিয়া ছেলের সঙ্গে শুধু স্নেহহীন লড়াই। মনের জ্বালায় মাঝে মাঝে মোহনের

চোখে জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, মার মুখের কঠোর ভাবটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও নরম হয় না।

'আমি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার সুরু করেছি? গায়ে পড়ে কবে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি শুনি? বাবা মারা যাওয়ার পর তুমিই বরং যা-তা আরম্ভ করে দিয়েছ আমার সঙ্গে!'

'আমি জানি, সব দোষ আমার। তুমি টাকা উড়োবে, বলতে গেলে দোষ হবে আমার।'

'কি দরকার তোমার বলার? হাজারবার তোমায় বলেছি, খরচ যেমন বেড়েছে, আয়ও তেমনি বাড়বে।'

'কিসে আয় বাড়বে? ব্যবসা করে? তুই করবি ব্যবসা! ব্যবসা করার মানুষ আলাদা। তারা আগে আয় বাড়িয়ে তারপর খরচ বাড়ায়—তা-ও তোর মত বাড়ায় না। ব্যবসায় লোকসান নেই?'

'লোকসান যায়, আমার টাকা যাবে।'

'টাকা বুঝি তোর একার? একা তোকে উনি সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন, তুই যা খুশী তাই করবি বলে?'

ভীত চোখে তারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল—দুজনেই। তারপর মা তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—একেবারে যাকে বলে পলায়ন করা।

এমন স্পষ্ট ভাবে নগ্নভাবে মা ও ছেলের মধ্যে লড়াই হইল এই প্রথম। কে জানে এ লড়াই কোথায় গিয়া ঠেকিবে, কি পরিণাম দাঁড়াইবে?

❀

লড়াইটা স্থগিত রহিল প্রায় পনের দিন।

তার মধ্যে আর একটা উৎসব হইয়া গেল বাড়ীতে, নগেনের জন্মদিন উপলক্ষে। আগের বারের পার্টির চেয়েও অনেক বেশী টাকা খরচ হইয়া গেল। টাকার বিষয়ে মা কর্ত্তালি করিতে চাওয়ায় মোহনের যেন আরও বেশী খরচ করার গোঁ চাপিয়াছে।

জন্মদিনে এত লোক ডাকিয়া এত ঘটা করিয়া উৎসব করিতে হয়, এ বাড়ীতে কারো তা জানা ছিল না। বাড়ীতে এত লোক থাকিতে নগেনের জন্মদিনেই বা কেন?

বাহিরের অনেকের কাছেও ব্যাপারটা একটু দুর্ব্বোধ্য ঠেকিতে লাগিল। সাত দিন পরেই ভাই-এর জন্মদিনে সকলকে নিমন্ত্রণ করার ইচ্ছা যদি মোহনের ছিল, সেদিন অকারণে সকলকে ডাকার কি প্রয়োজন ছিল তার?

তাড়াতাড়ি সকলের সঙ্গে ভাব জমাইয়া ফেলিবার জন্য মোহন যে কী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, জানা থাকিলে হাসিই সকলের পাইত।

সেদিন পার্টি দিয়া মোহন টের পাইয়াছিল, মানুষের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতা জমানোর এই উপায়টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সকলকে বাড়িতে আনিয়া উৎসব করা। একটু বাড়াবাড়ি যদি হয় তো হোক। আরম্ভ করিতেই তার দেরী হইয়া গিয়াছে অনেক, তাড়াতাড়ি না করিলে চলিবে কেন? ধীরে সুস্থে সহরের সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিবার সময় তার নাই, তাকে অন্যদিকে মন দিতে হইবে। সেদিকটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—এবং গুরুত্ব দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে।

খরচ সম্পর্কে মার অনাবশ্যক কর্ত্তালি পছন্দ না করিলেও টাকার ব্যাপারে উদাসীন থাকিবার উপায় নাই। দুশ্চিন্তা না হোক, টাকার চিন্তা করিতে হয় বৈকি। টাকা যে তাকে আনিতে হইবে, সে তা জানে— প্রথম হইতেই জানিত। গ্রামে বাস করিবার সময় সহরের জীবনের কল্পনায় আয় বাড়ানোর জন্য নিজের কর্ম্ম ব্যস্ততাও সে কি কল্পনা করে নাই?

সে সব কল্পনার অনেক কিছুই বদল হইয়াছে সত্য কিন্তু মূল কথাগুলি বদল হয় নাই। কেবল সহরের সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলা নয়, আয় বাড়াইবার ব্যবস্থাও তাকে করিয়া নিতে হইবে।

তবে খরচ যে এত বেশী হইবে, কাজে নামার আগে এদিকের জীবনটা গড়িয়া তুলিবার সময় সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতে হইবে—এ ধারণা তার ছিল না।

তা হোক, সময় যা আছে, তাই যথেষ্ট। দশজনের মধ্যে নিজের স্থানটি দখল করার জন্য তাকে শুধু উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

নগেনের জন্মদিনের উপলক্ষ না থাকিলেও মোহন কোন কারণ ছাড়া এমনিই সকলকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিত। মানুষকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনন্দ করা তো দোষের নয়।

এবারও অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল—আগের বারের চেয়ে বেশী। কিন্তু মা এবার কিছুই বলিলেন না।

রাগের মাথায় সেদিন যে কথা বলিয়া ফেলিয়া ছেলের সম্মুখ হইতে তিনি পলাইয়া গিয়াছিলেন, আরও স্পষ্ট করিয়া সেই কথা বলিয়া ফেলিবার ভয়ে একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন।

মোহন বুঝিল অন্যরকম। সে ভাবিল, নগেনের জন্মদিনের উৎসব কিনা, এটা তাই মার কাছে অপব্যয় নয়।

নগেনকে সে উপহার দিল একটি মোটর সাইকেল।

ঝরণাকে উপহারটি দেখাইতে গ্যারেজে গিয়া দু'জনে বহুক্ষণ না ফিরিয়া আসায় মোহন নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। শ'খানেক মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনায়, দায় দায়িত্ব এড়াইয়া সে গেল খবর নিতে। গ্যারেজে গিয়া শুনিল ঝরণা নগেনকে বলিতেছে, 'না না, এতেই হবে, সাইড-কার দরকার নেই। ক্যারিয়ারে বসে খুব যেতে পারব আমি।'

'কোথায় যাবে তোমরা?'

'বজ্‌বজ্‌।'

মোটরবাইকে দু'জনে বজ্‌বজ্‌ বেড়াইতে যাইবে কি না, তাই বাড়ীর ভিতরে মানুষের ভিড় এড়াইয়া গ্যারেজে মোটরবাইকটার কাছে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে আসিয়াছে।

পীতাম্বর রোয়াকে বসিয়া আছে, তবু এখানে পরামর্শ করাই সুবিধা, কেউ বাধা

দিবার নাই। আসিয়াছে তারা অনেকক্ষণ, এক ঘণ্টার কম নয়। এত দেরী না করিলে মোহন তাদের খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করিত না।

আর কিছু নয়, সত্যসত্যই দু'জনে গ্যারেজে বসিয়া গল্প করিতেছে কি না জানিবার জন্য মোহনের বড়ই কৌতূহল হইয়াছিল।

কুড়ি বছরের বালকের সঙ্গে পঁচিশ বছরের নারীর বন্ধুত্ব অদ্ভুত, খাপছাড়া ব্যাপার। নগেনের এই বয়সে ঝরণার সঙ্গে চার পাঁচ বছর বয়সের তফাৎটা দু'জনের মধ্যে চাঁদ আর পৃথিবীর ব্যবধান হইয়া থাকিবে। ড্রয়িংরুমে, বারান্দায়, নগেনের পড়ার ঘরে, নির্জন গ্যারেজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'জনের গল্প করাটা সত্যই যুক্তিহীন অসঙ্গত ঘটনা।

'তোমায় ডাকছে ঝরণা।'

'কে?'

'লীলা ডাকছে।'

'লীলা? লীলা তো এসেই চলে গেছে কখন—ফিরে এসেছে নাকি আবার?'

'কি বলছি, লীলা নয়। লাবু তোমার খোঁজ করছিল।'

প্রত্যেক মানুষকে জীবনে মাঝে মাঝে নিজের মৃত্যু কামনা করিতে হয়। ঝরণার মুখ লাল দেখায় মোহনের প্রতিফলিত অপমৃত্যুর মত।

'বলুন গে' যাচ্ছি।'

ঝরণা নীরবে চলিয়া গেলে মোহনকে মনে মনে মরিয়াই থাকিতে হইত, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার অতি মন্দ আর বিপজ্জনক কর্ত্তব্য করার গৌরবে আহত সৈন্যের মত মোহন জীবন্ত হইয়া উঠিল।

এত যখন তেজ ঝরণার, ওকে আরও অপমান করা চলে। আরও অপমান করাই কর্ত্তব্য।

'একটু দেখা শোনা করবি যা নগেন? তোর সত্যি কাণ্ডজ্ঞান নেই। একা কতদিক সামলাব?'

'যাই।'

'যাই নয়, যাও।'

দু'জনেই গেল, আগে নগেন, তার পিছু পিছু ঝরণা। একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিতে গিয়া মোহন দেখিল, আঙ্গুলগুলি তার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

'কাঠিটা দাও তো বাবা, নিভিও না।"

'আপনার দেশলাই নেই? বাক্সটা তবে রেখে দিন।'

পীতাম্বর বিড়ি ধরাইয়া বলিল, 'দেশলাই আছে। তুমি কাঠিটা ধরালে তাই চেয়ে নিলাম।'

দিয়াশলাই-এর একটা কাঠিও অপচয় করে না, মানুষটা হিসাবী বটে। মোহনের বাবারও এই রকম হিসাব ছিল, উনানে জ্বলন্ত কয়লা থাকিতে দেশলাই জ্বালিয়া টিকা ধরাইয়া তামাক দিলে আর রক্ষা থাকিত না।

হিসাবের আঁটঘাঁট বাঁধা তাঁর দীর্ঘজীবন এক মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় বাসের নীচে সমাপ্তি পাইয়াছে। মনে মনে পয়সার হিসাব কষিতে কষিতেই হয়তো তিনি অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, হয়তো ভাবিতেছিলেন, হাঁটিবেন অথবা বাসে উঠিয়া কটা পয়সা খরচ করিবেন।

কলিকাতা আসিয়াছিলেন তিনি বাজার করিতে, জিনিষ কিনিয়াছিলেন কয়েকশ' টাকার। তার মধ্যে তাঁর নিজের জন্য ছিল একটি চটি, দু'জোড়া কাপড় আর এক সের তামাক। বাকী সব কিছু তাদের জন্য। লাবণ্যের জন্য একটি সেলাই-এর কলও ছিল।

ছেলে মেয়ে, ছেলের বৌ, নাতি নাতনীর জন্য সেই তাঁর প্রথম আর শেষ বাজার করা নয়। কার কি বাজার চাই জানিয়া কোন চাওয়া বাতিল আর কোন চাওয়া মঞ্জুর করিতেন, তারপর লম্বা ফর্দ্দ নিয়া বছরে তিন চার বার আসিতেন কলিকাতা। বাঁচিয়া থাকিতে বাপের বিরুদ্ধে মোহনের অনেক অভিযোগ ছিল, এখন সে কেবল দুঃখ বোধ করে। আজীবন এক সঙ্গে থাকিয়াও সে

তাঁর জীবনযাপনে সামঞ্জস্যহীন হিসাবের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই, এখনো পারে না।

জীবনের তাঁর সবচেয়ে বড় কথা ছিল হিসাব এবং সে হিসাব ছিল লক্ষ্যহীন জড়ধর্ম্মী বিকার।

বাপের অসার্থক, অসম্পূর্ণ, বঞ্চিত জীবনের কথা ভাবিয়া মোহন আজও গভীর বিষাদ অনুভব করে।

পীতাম্বর বলে, 'দেশ থেকে কোন চিঠিপত্তর পেয়েছ বাবা?'

'ঘনশ্যামের চিঠি পেয়েছি।'

'কিছু লিখেছে নাকি, আমার বাড়ীর খবর?'

'না।'

'চিঠি আসে না, কদিন থেকে ভাবছি কি হল। কি লিখেছে ঘনশ্যাম? ফসল কেমন হল জানিয়েছে কিছু? তেমাথায় টিউবওয়েল বসিয়েছে নাকি? বসাবে বসাবে করে দু'বছর ঘুরে গেল, চোত মাসটা ফের শীলপুর থেকে জল এনে খেতে হবে।'

আলো ঝলমল বাড়ীর দিকে চাহিয়া নিমন্ত্রিতদের হাসি ও কথার মিশ্র কলরব শুনিতে শুনিতে পীতাম্বর ভাবিতেছে দেশে তার আপনজনের কথা, ফসলের কথা, তেমাথার টিউবওয়েল বসানোর কথা! কি হইতেছে বাড়ীর ভিতরে দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও কি হয় না মানুষটার?

'খেয়ে এসেছেন?'

'এইবার যাব, এক ফাঁকে গিয়ে খেয়ে আসব।'

বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঝরণাকে দেখিয়া মোহন স্বস্তি বোধ করিল। এতক্ষণ এইটুকুই সে আশা করিতেছিল। ঝরণা রাগ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকিলে এক বিষয়ে মোহনকে হতাশ হইয়া যাইতে হইত।

এখনো তার আশা আছে যে নগেন আসল কথা কিছু বুঝিতে পারে নাই,

ছেলেমানুষ তো নগেন। ঝরণা যে অপমান পাইয়া রাগ করিয়াছে তাও হয়তো সে জানে না।

ঝরণা রাগ করিয়া না খাইয়া চলিয়া গেলে নগেনের কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিত না।

ঝরণার সংযমে মোহন রীতিমত কৃতজ্ঞতা বোধ করে, হঠাৎ অসভ্যতা করিয়া ফেলার জন্য তার লজ্জা ও অনুতাপ বাড়িয়া যায়।

নিজের অসঙ্গত ব্যবহারের একটা অজুহাত সে ইতিমধ্যে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এ তার দীর্ঘকাল গ্রামে বাস করার ফল, যেখানে নির্জ্জনে কোন ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে, বিশেষত ঝরণার মত রূপসী মেয়েকে কথা বলিতে দেখিলেই মানুষ যা তা ভাবিয়া বসে।

নিজের ব্যবহারের জন্য নিজের অতীত জীবনকে দায়ী করিয়া—ঝরণাকে সহজভাবে চলা ফেরা করিতে ও কথা বলিতে দেখিয়া ক্রমাগত বেশী বেশী দায়ী করিয়া—মোহনের আরও খারাপ লাগে। তার মত অমার্জ্জিত সঙ্কীর্ণ গেঁয়ো মানুষের পক্ষে ওরকম অসভ্যতা করাই স্বাভাবিক ভাবিয়া যদি ঝরণা তাকে উদারভাবে ক্ষমা করিয়া থাকে, তার চেয়ে ব্যাপারটা আরও কুৎসিত দাঁড়ানো ঢের ভাল ছিল।

অতি কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, সহজভাবে এক সময় মোহন ঝরণাকে বলে, 'তুমি খাবে না ঝরণা?'

'একটু পরে খাব।'

'চিন্ময় তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলছে। ও চলে যাক, তোমায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। আমিই না হয় দিয়ে আসব। কেমন?'

'আচ্ছা।'

ঝরণার এই আরও বেশী উদারতায় মোহনের স্বস্তি যেমন বাড়ে, তেমনি নিজেকে আরও বেশী বেশী গেঁয়ো মনে হয়!

যাওয়ার সময় ঝরণা কিন্তু তাকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেল!

সঙ্গে গেল নগেন।

বিদায়গামী একটি পরিবারের সঙ্গে মোহন গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গল্প করিতে করিতে সামনে দিয়া দুজনে চলিয়া গেল, একবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া দেখিল না!

বুঝা গেল নগেনকে সাথী করিয়া ঝরণা হাঁটিয়াই বাড়ী যাইতেছে!

পরদিন সকালে ঝরণাকে নূতন মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসাইয়া বজবজ বেড়াইয়া আসিতে বাহির হইয়া একশ' গজ পথ যাইতে না যাইতেই নগেন একটা অ্যাকসিডেণ্ট ঘটাইয়া দিল।

গাড়ী আস্তেই চলিতেছিল, এখানে ওখানে কাটা ছেঁড়া আর ঝরণার বাঁ হাতটা একটু মচকাইয়া যাওয়া ছাড়া দুজনের বিশেষ কিছু হইল না।

মোহন বুঝিতে পারিল না এই দুর্ঘটনায় মনে মনে সে কেন খুসী হইয়াছে। ভয়ানক কিছু অনায়াসেই ঘটিতে পারিত কিন্তু ঘটে নাই বলিয়া?

দূরে গিয়া জোরে গাড়ী চলার সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া দুজনের মারাত্মক রকম আহত হওয়া, এমন কি মরিয়া যাওয়াও অসম্ভব ছিল না।

সেটা ঘটে নাই বলিয়া সে খুসী হইয়াছে?

অথবা ওদের দুজনের বজবজ গিয়া সারাটা দিন কাটাইয়া আসা সম্ভব হইল না বলিয়া?

এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে ছেলের উপর মা আরক চোট গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন।

বাড়ীর শ'খানেক গজ দূরে অ্যাকসিডেণ্ট করিয়া দু'জনে ফিরিয়া আসিলে নগেনের এখানে ওখানে সামান্য ছাড়িয়া যাওয়া কাটিয়া যাওয়ার সামান্য রক্তপাত দেখিয়াই একেবারে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া মোহনকে বলিলেন, 'কেন তুই এসব কিনে দিস ওকে? ভাইটাকে মারতে চাস?'

দুর্ঘটনায় নগেন ব্যথার চেয়ে লজ্জা পাইয়াছিল বেশী।

সে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার কিছু হয় নি মা। একটু শুধু কেটে ছড়ে গেছে।'

মোহন গম্ভীর মুখে কঠোর স্বরে বলে, 'তুমি অনেকদিন থেকে মোটর-বাইকের জন্য আবদার করছিলে—জন্মদিনে তাই ওটা প্রেজেণ্ট দিয়েছিলাম। তোমায় মারবার জন্য দিই নি। ওটা আমি ফিরিয়ে নিলাম।'

মচকানো হাতের ব্যথায় ঝরণা কাতরাইতেছিল—তার কাতরানি পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়।

মোহন আরও কঠোর স্বরে বলে, 'এবার থেকে আর কোন আবদার জানিয়ে আমাকে জ্বালাতন কোরো না। তোমার যা দরকার হবে মার কাছে চাইবে। মা বললে কিনে দেব।'

সকলে মুখ কালো করিয়া থাকে।

সত্যই তো।

সকলেই জানে নগেনের একটি মোটর সাইকেলের সাধ অনেকদিনের। বাপের কাছে অনেকবার চাহিয়া পায় নাই। বাপের মৃত্যুর পর মোহন ভাই-এর জন্মদিনে উৎসব করিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে ভাই-এর পুরাণো সাধটা মিটাইয়াছে।

সে-কি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী? মার কি উচিত হইয়াছে ওরকম বিশ্রী মন্তব্য করা যে ভাইকে মারিয়া নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যই সে তাকে মোটর সাইকেলটা উপহার দিয়াছে?

ছেলের কাছে মা আরেকবার হারিয়া গেলেন!

ডাক্তার এবং ডাক্তারখানা বাড়ীর প্রায় পাশেই বলা' যায়। ডাক্তার আসিয়া ঝরণার মচকানো হাতে ওষুধের প্রলেপ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া এবং দু'জনের কাটা ছড়ায় ওষুধ লাগাইয়া বলিয়া গেলেন, 'খুব অল্পের উপরেই গেছে। আর কিছু করতে হবে না।'

ঝরণাকে বলিলেন, 'দু'একদিন খুব ব্যথা হবে, বাস্।'

ডাক্তার চলিয়া যাওয়ার পর ঝরণা আবার কাতরাইতে আরম্ভ করিলে মোহন বলে, 'তোমার নিজেরই দোষ। ছেলেমানুষ, নতুন গাড়ীটা পেয়েছে, তোমায়

ক্যারিয়ারে চাপিয়ে চালাতে পারে? স্পিডে চলার সময় অ্যাকসিডেণ্ট হলে কি হত বল তো? নগেনের হয়তো আজ প্রাণ যেত!'

বলিয়াই মোহন টের পায় এটা তার কঠোরতা নয়, নিষ্ঠুরতা নয়, স্রেফ গ্রাম্যতা। সামান্য আহত নগেনকে দেখিয়াই মা যেমন আর্তনাদ করিয়া তার উপর গায়ে ঝাল ঝাড়িতে চাহিয়াছিলেন, ঝরণা ক্যারিয়ারে চাপিয়াছিল বলিয়াই অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়াছে ঘোষণা করিয়া সেও ঠিক একইরকম গায়ের ঝাল ঝাড়িতেছে!

ঝরণা উঠিয়া দাঁড়ায়।

বলে, 'যাই, বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাকি।'

কী কাতরতা ফুটিয়াছে নগেনের মুখে। লজ্জায় দুঃখে মরিতে চাওয়ার মত। মাথা হেঁট করিতে চায়, নিজের হাত পা কামড়াইতে চায়। সকলের সামনে সেটা তো করা যায় না। নীরবে ঝরণার মুখের দিকে কাতর চোখে চাহিয়া থাকে।

নিজের মনে একটা লড়াই করিতে করিতে জয় পরাজয় তুচ্ছ করিয়া মোহন বলে, 'তোমার তো বেশী লাগেনি নগেন। ঝরণাকে পৌঁছে দিয়ে এসো না? একটা রিক্‌সা ডেকে দিচ্ছি।'

রাত্রে মোহনের বক্ষলগ্না হইয়া লাবণ্য যেন নালিশের স্বরে বলে, 'ধন্য তুমি। কী ভাবে সকলকে খেলালে!'

'খেলালাম?'

বক্ষলগ্না হয়ে থাকার সময় লাবণ্যের অসীম সাহস দেখা যায়, মোহনের পক্ষে চরম অপমানজনক কথাও সে অনায়াসে যেন খেলার ছলেই বলিয়া যাইতে পারে।

'কি ভাবে মাকে জব্দ করলে! কি ভাবে ঝরণা হারামজাদিকে বুঝিয়ে দিলে তোমার ছেলেমানুষ ভাইটির সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না। আবার কি ভাবে ভাইটিকে দিয়েই এক রিক্‌সায় ঝরণাকে—'

মোহন উঠিয়া গিয়া আলো জ্বালে, সোফায় বসিয়া মোটা একটা বই তুলিয়া

নিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলে, 'তুমি ঘুমোও। আমি কয়েকটা হিসাব নিকাশের কাজ সেরে শোব।'

লাবণ্যের কান্নায় শব্দ শুনিয়া বিলাতে ছাপানো ইংরাজী বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খাটের কাছে গিয়া বলে, 'কেঁদো না। কাঁদলে মারব—তোমার এই ছিঁচকেমি কান্না বন্ধ করে অন্য কান্না কাঁদাব।'

পাশ ফিরিয়া শুইয়া কান্না থামাইয়া মড়ার মত কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে লাবণ্য। ভাবে, কি তার লাভ হল সহরে বাস করতে এসে?

সাত

শীতের কুয়াসায় সহরে ধোঁয়া মিশিয়া আলোগুলিকে ম্লান করিয়া দেয়। অপরাহ্নে বাতাস যেন একেবারে মরিয়া যায়, ভাসিয়া যাওয়ার বদলে ধোঁয়া অতি ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কখনো কুণ্ডলী পাকাইয়া সোজা উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

চোখ জ্বালা করে, মনে বিষাদ জাগে।

এর চেয়ে অন্ধকার যেন ভাল লাগে। ভোঁতা বিষণ্ণতার চেয়ে যেমন ভাল লাগে অচেতন মন।

শ্রীপতির মনের বিষাদ কিন্তু কমিয়া গিয়াছে।

একবার সে দেশের গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়াছে।

দু'দিনের বেশী কদম তাকে তিন দিন থাকিতে দেয় নাই, তাড়া দিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছে কলিকাতায়!

ক'মাস দুটি পয়সা রোজগার করিয়াই রোজগারের সাধ মিটিয়া গেল নাকি শ্রীপতির? আর ভাল লাগে না? বৌ আর ছেলেমেয়ের পেটে দুটি অন্ন যাইতেছে, অমনি বুঝি শনি ভর করিল কাঁধে?

না, আরামে আলস্যে ঘরে বসিয়া দিন কাটানো চলিবে না শ্রীপতির, ঢিল দিলে চলিবে না। পয়সা রোজগারের যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে পুরোমাত্রায় তার সদ্‌ব্যবহার করিতে হইবে।

কদম নিজেও তো মরিয়া যাইতেছে না, ফুরাইয়া যাইতেছে না! শ্রীপতির হইয়াই সে দেশের ঘরে কষ্ট করিয়া দিন কাটাইবে—সুখের দিনের জন্য।

জোরের সঙ্গে তেজের সঙ্গে কদম এই একটা বিষয়ে বার বার তাকে আশ্বাস দিয়াছে—শ্রীপতির কোন ভয় নাই, কদম তারই আছে এবং চিরদিন তারই থাকিবে। কোন পুরুষের সাধ্য নাই কোন প্রলোভনে তাকে ভুলায়। স্বামী বিদেশে পয়সা কমাইতে গেলে তার মান কি করিয়া বজায় রাখিতে হয় কদম তা ভাল করিয়াই জানে।

বলিয়াছে, 'টের পাই না ভেবেছ নাকি? তুমি খালি ডরাচ্ছ—একলা পেয়ে কদমকে কে বিগড়ে দেবে। কদমকে চেনো না তুমি? এতকাল এত কষ্ট সয়ে এলাম না? আজ কদমের জন্য তুমি গেছ পয়সা কামাতে, কদম বিগড়ে যাবে! কেন, কদম মরতে জানে না?'

গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছে, 'আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে? সহরে কত ডাইনী থাকে জানি না বুঝি?'

কদম বিদায় করিয়া দিলেও শ্রীপতির মনে কিন্তু দুঃখ হয় নাই। দুদিন কদম তাকে খুব যত্ন করিয়াছে, চুলে তেল দিয়া খোঁপা পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছে তার জন্য। শ্রীপতি সব চেয়ে আরাম-বোধ করিয়াছে কদমের জন্য তার ভয় আর সন্দেহ কাটিয়া যাওয়ায়।

মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে তার।

বিকালে ষ্টেশনে নামিয়াছিল, তখন কিন্তু শ্রীপতি বাড়ী যায় নাই। একটু রাত হইলে চুপি চুপি চোরের মত উঠানে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শুধু সন্দেহেই কি সে অন্ধকার দেখিতেছিল জগৎ! তারপর ঝনঝনে আওয়াজে প্রশ্ন আসিয়াছিল 'ক্যারে?'

কদমের নয়, পাড়ার নিতু পিসীর গলা। বয়স চল্লিশের বেশী, কালো মহিষের মত চেহারা। এ পাড়ায় গলা খুলিলে আরেক পাড়ায় শোনা যায়।

হ্যাঁ; শ্রীপতির বাড়ী না থাকার সুযোগে কদমের সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়াছিল গাঁয়ের দু'একটা মুখপোড়া বাঁদর। কদম নিজেই অবশ্য মুখে তাদের মুড়ো জালিয়া দিতে পারিত, তবু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিতু পিসীকে সে ডাকিয়া আনিয়াছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিতু পিসী তাকে পাহারা দিতে আসে।

'এমনি নয়। আট গণ্ডা পয়সা নেবে মাসে।'

না, কদম তেমন নয়। যা-খুসী করবার সুবর্ণ সুযোগ সে কাজে লাগায় না, নিজেই নিজের পাহারা বাসায়।

শ্রীপতির বুকে জোর আসে, কাজে আনন্দ হয়, কদমের জন্য আরও বেশী, আরও অনেক বেশী রোজগার করিবার কল্পনা চব্বিশ ঘণ্টা মনের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়।

এবার সহরে ফিরিবার আগে হইতেই সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, কদমকেও সহরে লইয়া আসিবে।

এখনই অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। একটা ঘর ভাড়া করিয়া কদমকে কাছে আনিয়া রাখার খরচ সে কোথায় পাইবে? মোহনের বাড়ীতে থাকে আর খায় বলিয়া নিজের তার একরকম কোন খরচ নাই, কদমকে তাই টাকা পাঠাইতে পারে। ঘর ভাড়া করিয়া নিজের পয়সায় খাইতে হইলে কদমের জন্য কটি পয়সা তার বাঁচিত?

আরো টাকা চাই, অন্ততঃ এখনকার দুগুণ টাকা চাই। রোজগার না বাড়িলে কদমকে সে আনিতে পারিবে না। দিন রাত্রিগুলি তার একা কাটাইতে হইবে। একেবারে একা।

পীতাম্বর আছে, জ্যোতি আছে, মদন আছে, কারখানায় কয়েকটি সহকর্মীর সঙ্গেও তার বেশ খানিকটা খাতির জমিয়াছে। কিন্তু কদম কাছে না থাকিলে কে

আছে শ্রীপতির ? কদম না থাকিলে কি মানে হয় বন্ধু থাকার ! কদম থাকিলে কত ভাল লাগিত সহরে নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা !

সহর আর তেমন বিস্ময় জাগায় না, হাঁ করিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি দেখা আর নতুন কাজ শেখা আর তেমন ভাবে আনমনা করিতে পারে না।

চাঁপার ঘরের নেশার ধাঁধাঁ, আর প্রচণ্ড স্ফূর্তির আকর্ষণ ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। জ্যোতি সঙ্গে নিতে চাহিলে বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে। সে বাড়ী না থাকায় কদম ওদিকে বাড়ীতে নিজের পাহারা বসায়। এখানে চাঁপার ঘরে গিয়া সে মজা করিবে ? এত কষ্টের পয়সা নষ্ট করিবে ?

'না ভাই ভাল লাগে না।'

'ধেৎ ! ভাল লাগবে। চ'।'

'নাঃ, পয়সা নেই।'

জ্যোতির সঙ্গে না যাক, একা একদিন চাঁপার কাছে না গিয়া সে কিন্তু থাকিতে পারে না।

কদমের জন্যই যাইতে হয়। দীর্ঘ বিরহের পর কদমের সঙ্গে দু'দিনের মিলন এবার তাকে যেন কি করিয়া দিয়াছে, প্রথম যৌবনে বৌকে প্রথম ঘরে আনার প্রথম দিকের রোমাঞ্চকর তেজ, ধৈর্য্যহীন অফুরন্ত আগ্রহ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতের হিসাব নিকাশের কোন জবরদস্তি যেন মানিতে চায় না।

কদমের জন্যই নূতন যৌবনের জোয়ারের মত এই উন্মাদনা।

কিন্তু কদম অনেক দূরে।

আজ নয়, কাল নয়, আগামী মাসে নয়, কে জানে কবে কদমকে কাছে আনা চলিবে !

চাঁপা কাছেই থাকে, যাইবে কি যাইবে না ভাবিতে ভাবিতেও চাঁপার ঘরে গিয়া পৌছানো যায়।

চাঁপা খুসী হইয়া আদর করিয়া বসায়, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, 'একলা কেন গো? স্যাঙাৎ কই?'

শ্রীপতি ঢোক গিলিয়া আমতা আমতা করিয়া বলে, 'আজকে আমিই এলাম চাঁপা।'

'বটে? সে বুঝি আসবে না?'

চোখের পলকে চাঁপা যেন বদলাইয়া যায়! কোথায় যায় তার এলোমেলা দোলন দোলন নড়াচড়ার ভঙ্গি, কোথায় যায় তার অমায়িক হাসি।

মুখ বাঁকাইয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'একলা এলাম চাঁপা! স্যাঙাৎ সাথে এনে চেনা করিয়ে দিল, আজকে আমি একলা এলাম চাঁপা! বেরিয়ে যা ঘর থেকে মুখপোড়া বজ্জাত কোথাকার!'

গাল দিতে দিতে জ্যোতির বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে সে দূর করিয়া দেয়।

জ্যোতির সে যেন বিয়ে করা সতীলক্ষ্মী বৌ, শ্রীপতি বাড়ী না থাকিলে গাঁয়ের কেউ ইয়ার্কি দিতে আসিলে কদম যেমন করে তেমনি করার অধিকার যেন তারও পুরামাত্রায় আছে।

দেহ বেচা যার ব্যবসা তার এটা কোনদেশী নীতিজ্ঞান? কি মানে চাঁপার এই অদ্ভুত ব্যবহারের?

দু'দিন পরে জ্যোতি তার পেটে আঙুলের খোঁচা দিয়া বলে, 'বেশ, দাদা বেশ, ডুবে ডুবে জল খেতে গিয়েছো?'

লজ্জায় শ্রীপতি মাথা তুলিতে পারে না।

জ্যোতির কিন্তু রাগ হয় নাই, সে শুধু আমোদ পাইয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার পরে সে জোর করিয়া শ্রীপতিকে ধরিয়া নিয়া যায়, আলাপ করিয়া দেয় চাঁপার প্রতিবেশিনী দুর্গার সঙ্গে।

চাঁপাও আজ হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলে, সেদিন তার একলা আসার ব্যাপার নিয়া তামাসা পর্য্যন্ত করে!

জ্যোতি জানিত, চাঁপাও বুঝিতে পারিয়াছে যে বন্ধুর সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা

করে নাই—তার ধারণাই ছিল না যে ওভাবে চাঁপার কাছে আসিলে কোন দোষ হয়।

দুর্গা মোটালোটা শান্ত ভাল মানুষ, চাঁপার মত চপল নয়। বেশভূষা তার দ্বিতীয় বয়সী গৃহস্থ ঘরের বৌ-এর মত, সীঁথিতে সিঁদুর পর্য্যন্ত আছে। তার চেহারায়, তার কথায় কাজে আর চালচলনে যেন একটা তেজ আর আত্মমর্য্যাদা-বোধ ধরা পড়ে। ভাঙাচোরা খোলার ঘরে সামান্য উপকরণ নিয়া নোংরা জীবন যাপন করিতে হওয়ায় সে যেন জগৎ-সংসারের উপর রাগ করিয়া গুম খাইয়া আছে।

প্রথম প্রথম শ্রীপতির রীতিমত ভয় করিতে থাকে। কথা না বলিয়া সে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে।

লণ্ঠনের বাতি একটু বাড়াইয়া দিয়া দুর্গা জিজ্ঞাসা করে, 'নতুন এয়েছো সহরে, না ?'

'না, নতুন কেন। অনেকদিন এয়েছি।'

'কারখানায় কাজ কর না ?'

'হাঁ। মস্ত কারখানা।'

'বৌ আছে না ?'

'আছে। দেশে।'

দুর্গার মুখে এবার একটু হাসি ফোটে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে শ্রীপতির সব খবর জানিয়া নেয়—সে কত রোজগার করে এই খবরটা পর্য্যন্ত !

শ্রীপতি বুঝিতে পারে দুর্গা তাকে সরল হৃদয় বোকাসোকা গেঁয়ো লোক বলিয়া ধরিয়া নিয়াই এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে—মনে মনে তার একটু রাগও হয়। কিন্তু দুর্গাও এমন সহজ সরল ভাবে প্রশ্ন করে যে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব না দিয়া সে পারে না।

সত্য কথাই যে সব বলে তা নয়। রোজগারের অঙ্কটা বাড়াইয়া প্রায় দ্বিগুণ করিয়া বলে। দুর্গা একটু হাসে।

সন্ধ্যা বলিয়াছিল সহরে পাপ বেশী। তর্কের খাতিরে বলিয়াছিল। জগদানন্দ স্বীকার করে নাই। আরেকদিন ওই প্রসঙ্গে জগদানন্দ মোহনকে বলে, 'সহরের বিরুদ্ধে বড় একটা অভিযোগ, সেখানে দুর্নীতি বেশী। খারাপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা ধরে হিসেব করলে তাই মনে হয়। কত বড় স্কেলে কলকাতায় দেহ বেচার ব্যবসা চলে শুনলে আপনি চমকে যাবেন। মনে হবে সহরের একটি লোকেরও বুঝি চরিত্র ঠিক নেই। কিন্তু এই দুর্নীতির প্রথম আর প্রধান কারণ কি জানেন? দারিদ্র্য। সপরিবারে যারা সহরে বাস করতে পারে না তাদের জন্যেই এই কুৎসিত ব্যবসাটা এত বাড়তে পেরেছে। শুধু পেটে খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না।'

মোহনের নবপরিচিত প্রতিবেশী অসীম বলে, 'কোয়াইট রাইট্'।

জগদানন্দ বলে, 'সহরে যারা থাকে, কুলি মজুর থেকে ভদ্রলোক পর্য্যন্ত, আজ যদি তাদের সপরিবারে সহরে বাস করবার ক্ষমতা হয়, অর্দ্ধেকের বেশী খারাপ স্ত্রীলোক কাল সহর ছেড়ে চলে যাবে।'

·অসীম বলে, 'আপনার কথাটা একটু জড়িয়ে যাচ্ছে।'

একটু থামিয়া সে জোর দিয়া, 'একটু ভুল বললেন। ও রকম হলে সহরের অর্দ্ধেক খারাপ স্ত্রীলোক সহর ছেড়ে চলে যাবে—একথাটা ভুলও বটে বলা অন্যায়ও বটে। মানেটা দাঁড়ায় যে সহরের দুর্নীতির জন্য ওরাই যেন দায়ী! ভাত কাপড়ের উপায় থাকলে ওরাও কি নিজেদের দুর্নীতির শিকার হতে দিত? সহরের সব মানুষের সপরিবারে সচ্ছলভাবে সহরে বাস করার ক্ষমতা হওয়া মানেই তো এখনকার অবস্থাটা একেবারে বদলে যাওয়া। ওরকম অবস্থায় মেয়েদেরও দেহ বিক্রি করার দরকার থাকবে না।'

জগদানন্দ খুসী হইয়া সায় দেয়, বলে, 'খারাপ স্ত্রীলোক আমি ঠিক ওই অর্থে বলি নি। বাধ্য হয়ে খারাপ পেশা নিতে হয়েছে, এই অর্থেই বলেছি। এরকম পেশা নিয়ে সহরের পয়সায় ভাগ বসাবার দরকার হবে না—সহরের একদিন সেরকম অবস্থা আসবে বৈ কি। সহরের নিন্দে করে অনেকেই, তলিয়ে কোন কথাই কেউ তো ভেবে ভাখে না।'

'আপনি সহরকে খুব ভালবাসেন মনে হচ্ছে।'

'তা বাসি। সহর আমার কাছে উন্নতি, প্রগতি, বৃদ্ধির প্রতীক। কারো সখে সহর গড়ে ওঠে না, কেবল আরামে থাকা আর মজা লুটবার জন্য সহর নয়। শিল্প, বানিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি সব কিছুর হেড কোয়ার্টার হল সহর। সহর দেখে দেশকে চেনা যায়, দেশের অবস্থা বুঝতে পারা যায়।'

অসীম তার শেষ কথাটা স্বীকার করে না।

'অন্য দেশে স্বাধীন দেশে তা হতে পারে, আমাদের এদেশে বোধ হয় সহর দেখে দেশ সম্বন্ধে উল্টো ধারণাই জন্মে। আপনি কি বলতে চান, কলকাতার রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী, পিচঢালা রাস্তা, দামী মোটরগাড়ীর স্রোত, এসব দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবে এদেশের লোক কি অবস্থায় দিন কাটায়? কলকাতা দেখে কেউ ভাবতে পারবে কত গরীব এদেশের মানুষ, খেতে পরতে পায় না, লেখাপড়া জানে না, অসুখে ভুগে মরে?'

জগদানন্দ জোর দিয়া বলে, 'নিশ্চয় পারবে। যে কোন দেশ হোক, সহর দেখে দেশের অবস্থা বোঝা যাবেই। জাহাজ থেকে নেমে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠে মার্কেটে একটা চক্র দিয়ে কেউ যদি ভাবে এই কলকাতা সহর, সে অবশ্য পারবে না। সমস্ত সহরটা যে দেখবে তাকে আর বলে দিতে হবে না কিসের মানে কি— একেবারে যদি অন্ধ আর মূর্খ না হয়। এত বড় সহরের কোন আর কতটুকু অঞ্চল ঝকঝকে, রাজপ্রাসাদ আর চওড়া সুন্দর পরিস্কার রাস্তাগুলি কোথায়, দুদিকের দোকানপাটগুলি কি ধাঁচের, সারি সারি দামী গাড়ী কোথায় পার্ক করছে, দেখলেই আসল ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ব্যবসা বাণিজ্যের সাহেবী অঞ্চলে পাক দিয়ে দেখতে যাবে আরেকটা অঞ্চল—আমাদের বড়বাজার। মাছ তরকারীর বাজারগুলি দেখবে। যারা মোটর চাপে তাদের পাড়া, যারা ট্রামেবাসে চাপে তাদের পাড়া, আর যারা পায়ে হাঁটে তাদের বস্তি ঘুরে ঘুরে দেখবে। কত লোক মোটর চাপে, কতলোক ট্রামেবাসে চাপে, কতলোক পায়ে হাঁটে, অনুমান করবে। রাস্তা দিয়ে যারা হাঁটে, তাদের কতজনের খালি

গা, কতজনের গায়ে ছেঁড়া নোংরা জামা লক্ষ্য করবে। সুস্থ শরীরের মনের আনন্দে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছে না ম্লান মুখে দুর্বল শরীরটা কোনরকমে বয়ে নিয়ে চলেছে, দেখবে। সহরে কটা হাসপাতাল আছে, খুঁজে বার করবে। আর দেখবে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা কি রকম। সহরতলীগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে আসবে। কত লোকের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই—ফুটপাতে শুয়ে কত লোক রাত কাটায় দেখে সেটা অনুমান করবে। তারপরেও সে যদি না বুঝতে পারে আমাদের অবস্থা কি রকম—'

'আপনার সঙ্গে তর্ক করা কঠিন।'

মোহন বলে, 'নিন, চা খান, চা জুড়িয়ে গেল।'

অনেক রাত্রে শ্রীপতি গেট খুলিয়া ভিতরে আসিল।

নিজের অপরাধে মনটা তার ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। অনুতাপ নয়, সংস্কার। নিষিদ্ধ কাজ করার অস্বস্তি বোধ।

দুর্গা চাঁপা হইলে তার এত খারাপ লাগিত না। তিনমাস আগেও দুর্গা স্বামীর সংসারে ঘর কন্না করিতেছিল। বছর দুই আগে সে স্বামীর সঙ্গে কলিকাতা আসিয়াছিল।

দেশে স্বামীটা তাকে বেশ ভালবাসিত, আদরযত্ন করিত। সহরে আসিয়া দিন দিন যেন কেমন হইয়া যাইতে লাগিল। মদ খায়, জুয়া খেলে, দুর্গাকে মারধোর করে। ঘর ভাড়া বাকী পড়ে, আজ খাওয়া জোটে তো কাল জোটে না। শেষে একদিন দুর্গার গয়না গাঁটি যা কিছু ছিল সব নিয়া কোথায় যে গেল মানুষটা। স্বামীর একটা বন্ধু ছিল,—অঘোর। সে আসিয়া দুর্গাকে রাখিল এখানে। মাস দুই পরে সেও ভাগিয়াছে।'

'কপালের দোষ তাই মুটিয়ে গেলাম, ছেলেপিলে হল না। ছেলেপিলে হলে ওনার স্বভাব কি বিগড়াত? এরকম মুটকি না হলে কি আরেকজন দু' মাসে মায়া কাটিয়ে ফেলে পালাত?'

দুর্গাকে দেখিয়াই শ্রীপতির ভয় আর সঙ্কোচ জাগিয়াছিল। তার এই গল্প শোনার পর গা যেন তার ছম ছম করিতে লাগিল। এখন দুর্গা অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, তাকে স্পর্শ করিলে আর দোষ হয় না, এই অকাট্য যুক্তিটা সে অবশ্য এখনো মনে মনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তবু তার কেবলি মনে হইতেছে সে যেন একটা মহাপাপ করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল তার জন্যই আজ একটি পরস্ত্রী অসতী হইয়া গেল।

পীতাম্বর ডাকিয়া বলিল, 'কোথায় যাস ছিপতি এত রাতে?'

'আজ্ঞে একটু কাজ ছিল।'

আলো জালিয়া এখনো পীতাম্বর দু'আনা দামের একটি খাতায় হিসাব লিখিতেছে। অনেক রাত করিয়াই বোধ হয় সে ফিরিয়াছে, আজকাল প্রায়ই তার ফিরিয়া আসিতে দশটা এগারটা বাজিয়া যায়।

পীতাম্বরের চালচলন আজকাল রীতিমত রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। মানুষটাও সে বদলাইয়া গিয়াছে অনেকখানি। আগে মুখ দেখিলেই মনে হইত সর্ব্বদা সে যেন কি একটা ধাপ্পাবাজির মতলব আঁটিতেছে, প্রার্থনা জানাইয়া ভিক্ষা করিয়া ভাঁওতা দিয়া কারো কাছে কিছু আদায়ের চেষ্টার মত কোন প্যাঁচালো মতলব আঁটিতেছে। আগে তার নিরীহ ভাবটা ছিল তাদের মত, পরের দয়ায় যারা বাঁচিয়া থাকে, এতটুকু অপরাধ করিয়া ফেলার ভয়ে সর্ব্বদা যারা সচকিত।

এখন তার মুখে কোন চিন্তারই ছায়া দেখা যায় না, প্রশান্ত মুখে স্থির দৃষ্টিতে সে জগতের দিকে তাকায়। তার যেন কোন দুঃখ নাই, নালিশ নাই, অভাব নাই। আপনজনদের ফেলিয়া আসিয়া মোহনের এই গ্যারেজের ঘরটিতে আশ্রয় পাইয়া সকাল হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তার যেন সন্তোষের সীমা নাই। অসহায় নম্রতার বদলে গম্ভীর অমায়িকতার সঙ্গে সে ব্যবহার করে। কথা বলে কম, আর কেমন যেন দূরে সরিয়া থাকে। ঘনিষ্টতা করিবার চেষ্টা করিলে যেন আরও দূরে সরিয়া যায়।

চেহারা আর বেশভূষাও পীতাম্বর বদলাইয়া ফেলিয়াছে। রীতিমত বাবু সাজিয়া সে বাহিরে যায়।

ঘরে সে ময়লা মোটা কাপড় পরে, ফতুয়া গায় দেয়, প্রাচীন বালাপোষটি গায়ে জড়াইয়া শীত নিবারণ করে, বাহিরে যাওয়ার সময় ফর্সা ধুতির উপর চাপায় ফর্সা সার্ট, তার উপর পরে ভাল কাপড়ের ভাল ছাঁটের কোট, পায়ে লাগায় পালিশ করা নতুন জুতা।

ঘরে ফিরিয়া সযত্নে জামাকাপড় ভাঁজ করিয়া রাখে, ন্যাকড়া দিয়া জুতার ধূলা সাফ করে। দু'খানা ভাল কাপড়, দুটি সার্ট আর ওই কোটটি তার সম্বল, তবু কখনো তাকে ময়লা জামা কাপড় পরিয়া বাহিরে যাইতে দেখা যায় না। একটি কাপড় আর সার্ট যখন ব্যবহার করে অন্য কাপড় আর সার্টটি তখন লণ্ড্রীতে আর্জেণ্ট হিসাবে ধোয়া হয়।

চেহারায় গ্রাম্যতার ছাপও সে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে। আগাগোড়া সমান করিয়া ছাঁটা ছোট ছোট চুল নিয়া সে কলিকাতায় আসিয়াছিল, এখন তার চুল বেশ বড় হইয়াছে। স্মার্ট ফ্যাশনে চুল ছাঁটিয়া রোজ সে সযত্নে চিরুণী চালাইয়া টেরি কাটে। ফাজিল ছোকরার বাঁকা টেরি নয়, সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ভদ্রলোকের সুবিন্যস্ত ভারিক্কি টেরি।

দাড়িও সে কামায়। প্রত্যেকদিন।

নিজেই কামায়। এজন্য সে ভাল একটি ক্ষুরও কিনিয়াছে।

ব্রাহ্মণ বলিয়া তাকে শ্রীপতি আগেও সম্মান করিত-কিন্তু সেটা ছিল শুধু তার ব্রাহ্মণত্বটুকুর সম্মান, মানুষটার নয়। আজকাল শ্রীপতি মানুষ হিসাবেও তাকে সম্মান করিতে সুরু করিয়াছে।

আগে দরকার হইলেই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিত কিন্তু তার সামনে, কখনো কখনো তার সঙ্গেও, হাসি তামাসা খোস গল্প করিতে শ্রীপতির বাধিত না। পীতাম্বরকে অবশ্য খোসগল্পে টানা যাইত না, সে ম্লান গম্ভীর মুখে চুপ করিয়াই থাকিত—শ্রীপতি সেটা তেমন গ্রাহ্য করিত না।

আজ শ্রীপতি ঠিক গুরুজনের মতই তাকে মান্য করিয়া চলে, নম্রভাবে সবিনয়ে তার সঙ্গে কথা বলে!

মাঝে মাঝে সে বিস্ময়ভরা চোখে পীতাম্বরের দিকে চাহিয়া থাকে। অবাক হইয়া ভাবে, কি মানুষটা এই সেদিন গাঁ হইতে সহরে আসিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে সে কি হইয়া গিয়াছে! চোখের সামনে বদলাইয়া না গেলে হঠাৎ দেখিয়া হয় তো সে পীতাম্বরকে চিনিতেই পারিত না!

বাড়ীর লোকেও অবাক হইয়া তাকে গ্যাখে, নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে।

লাবণ্য বলে, 'চালাক চতুর মানুষ তো, ফন্দিফিকির করে পয়সা উপায় করছে।

মোহন বলে, 'কিছু কিছু উপায় করছে সেটা বোঝাই যায়—কি ভাবে করছে তাই ভাবছিলাম।'

পীতাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াও এইজন্য মোহন সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল।

সদুপায়ে—পাঁচজনকে অনায়াসে জানানো যায় এমন উপায়ে—পীতাম্বর ইতিমধ্যেই কলিকাতা সহরে পয়সা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা তার বিশ্বাস হইতে চায় না।

জিজ্ঞাসা করিয়া পীতাম্বরকে শুধু বিব্রত করা হইবে—বানাইয়া বানাইয়া কতগুলি লাগসই মিথ্যা বলিতে বাধ্য করা হইবে।

একদিন মোহনের মনে হইল যে পীতাম্বর তার বাড়ীতে থাকে, পীতাম্বরের পয়সা রোজগারের উপায়টা প্রকাশ পাইয়া গেলে তাকে বিব্রত হইতে হইবে না তো?

পরদিন সকালে পীতাম্বরের বাবু সাজিয়া বাহির হওয়ার সময় সে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কাজকর্ম্ম কিছু করছেন নাকি?

'হ্যাঁ, বাবা, করছি কিছু কিছু।'

'কি কাজ?'

'এই ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি এটা ওটা।'

মোহন আশ্চর্য্য হইয়া যায়। এটা ওটা বিক্রী করিতে হইলে আগে তো এটা ওটা কিনিতে হয়! সে টাকা পীতাম্বর পাইল কোথায়? ওর কলিকাতায় আসিবার গাড়ীভাড়াটা পর্য্যন্ত তাকে দিতে হইয়াছিল।

'কি বিক্রি করেন?'

'এই সাইকেল, সেলায়ের কল, রেডিও, মোটর গাড়ী—'

'বলেন কি!'

পীতাম্বরকে খুব খুসী মনে হয়। একটু গর্ব্বের সঙ্গেই সে বলে, 'হ্যাঁ বাবা, কাল একটা গাড়ী বেচেছি। ধীরেনবাবু একটা গাড়ী কিনবেন শুনলাম কি না, চেনো না ধীরেনবাবুকে? কাছেই থাকেন, একুশ নম্বর বাড়ীতে। তা খবরটা শুনে মোটরওলার দোকানে গিয়ে বললাম, একজন গাড়ী কিনবে, ঠিকানা বললে আমায় কত দেবে? ঠিকানা নিয়ে ওরা লোক পাঠিয়ে দিলে, সে হল গিয়ে ওমাসের তেইশ তারিখ। কাল ধীরেনবাবু গাড়ীটা কিনেছেন। আমি ভাবছিলাম মোটরওলারা ঠকাবে বুঝি, তা গিয়ে চাইতেই কুড়িটা টাকা দিলে। কলকাতার লোকেরা বড্ড ভাল বাবা, কেউ কাউকে ঠকায় না।'

'মোটে কুড়ি টাকা দিলে?'

'ঠিকানা বলার জন্যে আর কত দেবে বাবা? ওই ঢের দিয়েছে। গাড়ীটা বিক্রী করেছে ওদেরি লোক। নিজে যদি কারো কাছে একটা গাড়ী বেচতে পারি—'

মোহন নিজে হইতে সাগ্রহে বলিয়াছিল, 'আমার জানা শোনা কেউ কিনবে শুনলেই আপনাকে জানাব। কুড়ি টাকা নয়, ফুল কমিশন আদায় করে নেবেন কিন্তু। এক কোম্পানী দিতে না চায়, অন্য কোম্পানী দেবে।'

যত পারে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পীতাম্বর পরিচয় করে।

মোহনকে সে কোন অনুরোধ করে না, মোহনের দ্বারা পরিচিত তাদের দিয়া

চেনা লোকের সংখ্যা বাড়ায়। পরিচিত লোক মোহনের কাছে আসিলে বাড়ীতে থাকিলেও সে সামনে আসে না, অচেনা লোক আসিলে ফর্সা জামা কাপড় পরিয়া গিয়া হাজির হয়, মোহনের সঙ্গে অকারণে দু'চারটি কথা বলে, পারিলে নতুন লোকটির সঙ্গেও বলে।

বেশীক্ষণ থাকে না, মোহনকে বিরক্ত হইবার সময় দেয় না।

দু'একদিনের মধ্যে, তাকে ভুলিয়া যাওয়ার সময় পাওয়ার আগেই, সে নতুন লোকটির বাড়ীতে যায়, বলে, 'মনমোহনবাবুর বাড়ীতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওখানেই থাকি আমি। এক গাঁয়ে বাড়ী আমাদের, সম্পর্ক কিছু নেই, তবে মোহন আমায় কাকা বলে ডাকে।'

তারপর আলাপ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিলে নিজেরই তোলা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে বলে, 'খাঁটি কথা, ঠিক বলেছেন! ব্যবসা ছাড়া পয়সা নেই। ওই মতলবেই এসেছি কলকাতায়, একটা কিছুতে নেমে পড়ব। তা আমরা হলাম অজ্ঞ গেঁয়ো লোক, আপনাদের বুদ্ধি পরামর্শ সাহায্য না পেলে—'

অনেকে সন্দেহ করে, প্রথমেই সতর্ক হইয়া যায়, স্পষ্টই তাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম পীতাম্বরের মনে লাগিত, এখন আর লাগে না। প্রথম প্রথম সে কিছু কিছু মিথ্যা বলিত, বাহাদুরী করিত, চাল দিত, কত যে চেষ্টা করিত মানুষের বিশ্বাস প্রীতি অর্জ্জনের জন্য। এখন ওসব সস্তা চালাকি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে যে এত পাকা ধাপ্পাবাজ সহরে আছে, এত রকমের ছলনা চাতুরী ধাপ্পাবাজির সঙ্গে সহরের লোকের পরিচয় যে তার গ্রাম্য বুদ্ধি দিয়া সহরের লোককে ভাঁওতা দিবার সাধ্য তার নাই।

তাই সে নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

সহজ সরলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, নিজের সম্বন্ধে নিজের যা ধারণা তাই প্রকাশ করে, অন্য কিছু বলিয়া প্রমাণ করিবার কোন চেষ্টা করে না যে সে একজন চালাক চতুর কাজের লোক। আর আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করে যে মিথ্যা আর চালবাজী বাদ দেওয়ার পর কারো সন্দেহ অবিশ্বাস এবং

অপমান করা এতটুকু ব্যথা দিতে পারে না, অল্প সময়ে বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায় বেশী লোকের !

কেন এমন হয় পীতাম্বর অবশ্য বুঝিতে পারে না।

হিসাব করা বানানো কথা বলিতে গেলে যে শব্দের অর্থ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না, অপরিচিত তার সম্পর্কে অনুভব-করা পরিচয়ের সঙ্গে তার বলিয়া দেওয়া পরিচয়ের বিরোধ যে তার সম্পর্কে বিশ্বাস ও ভাল ধারণা সৃষ্টিতে ক্ষতি করে, এসব বুঝিবার মত বুদ্ধি পীতাম্বরের নাই।

শুধু অভিজ্ঞতা তাকে বলিয়া দেয় যে সহজ সরলতায় কাজ দেয় বেশী। সহজ বুদ্ধিতে আরও একটা কথা সে বুঝিতে পারে, কারো কাছে টাকা ধার চাওয়া চলিবে না, অন্যায় সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চলিবে না।

সে দয়া চায়, অনুগ্রহ চায়, নিজের দুঃখ ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী বলিয়া সমবেদনার উদ্রেক করিয়া কিছু আদায় করিতে চায়, এ ধারণা সৃষ্টি হইতে দিলে চলিবে না।

ওটা ভিক্ষা করারই রকম ফের। ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ কথাটা পীতাম্বরের অজানা নয়!

মানুষ জিনিষ কেনে, তার মধ্যস্থতায় মানুষ সেই জিনিষগুলি কিনিবে, শুধু এইটুকু তার দরকার। এর বেশী সামান্য কিছু চাহিতে গেলেই তার ক্ষতি হইবে। একটু বিশ্বাস আর সহানুভূতি মানুষের মধ্যে জাগাইতে পারিলেই এই সাহায্যটুকু সে অনায়াসেই পাইবে।

পাইবে কেন, পাইতেছে।

মানুষ বড় ভাল, বড় উদার।

বাড়াবাড়ি করিলে, গায়ের উপর গিয়া পড়িলে, মানুষ বিরক্ত হইয়া রাগ করে। অন্যায় দাবী নিয়া উপস্থিত হইলে মানুষ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যার যতটুকু প্রাপ্য কেউ তা ফাঁকি দেয় না। তাই যদি দিত, চাহিয়া পাওয়ার বদলে টাকা কি সে উপার্জন করিতে পারিত কোনদিন? উপার্জন বাড়ানোর কল্পনা করা চলিত?

একটি মোটর গাড়ী বিক্রী করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারিত ভবিষ্যতে মোহনের, মত নিজের মোটর গাড়ী চাপার ?

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা টনটন করে, অনেক দূর হইতে আশ্রয়ে ফিরিবার সময় কি যে লোভ হয় ট্রামে বা বাসে উঠিয়া বসিবার !

কিন্তু তখন পীতাম্বরের আপনজনকে মনে পড়ার সময়। সারাদিন কারো কথা তার মনে থাকে না, খাতা দেখিয়া দেখিয়া এক ঠিকানা হইতে সে শুধু আরেক ঠিকানায় যায়, কে কি কিনিবে আর কে কতটুকু লাভের ভাগ দিবে তাই শুধু সে ভাবে।

খাতাটি পকেটে ভরিয়া মোহনের বাড়ীর দিকে পা বাড়ানো মাত্র সহরের মানুষের দখল একেবারে শেষ হইয়া যায়, গ্রাম আর গ্রামের আপন জনেরা সকলে মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসে, মনের আড়ালে গৃহিণী আর ছেলেমেয়েরা যেন এই সুযোগের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে।

ট্রামে বা বাসে পীতাম্বরের তাই আর চাপা হয় না।

গ্রামে অকর্ম্মণ্য পীতাম্বরেব কাছে ওদের জন্যই একটি পয়সার দাম ছিল অনেক, এখানেও তাই আছে।

মোহনের বাবার ছিল অনেক টাকা। সে পাঁচ সাত শ' টাকার সওদা করিতে সহরে আসিত। সহরের পথে হাঁটিয়া বেড়ানোটা ছিল তার সখ, ট্রাম বাসের খরচ বাঁচানোর প্রয়োজনে নয়।

ভাবিতে ভাবিতে আলোকিত সহরের পথেই পীতাম্বর হাঁটে, গাড়ী ঘোড়া বাঁচাইয়া চলে, মনে মনে একেবারে গ্রামে চলিয়া গিয়া ভুলিয়া যায় না সে কোথায় আছে। অতটা ভাবপ্রবণতা পীতাম্বরের নাই।

মন তার কেমন করে না, চোখের জল আসে না। কেবল দেশের ওদের কথা ভাবিতে তার ভাল লাগে। দেখিতে ইচ্ছা হয়, কাছে পাইতে সাধ জাগে।

কারো সে চাকর নয়, তবু একদিনের জন্য ছুটি তার নাই, সাধ হইলেও দেশে

ওদের দেখিতে গেলে তার চলিবে না, একথা মনে হইলে তার কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য ভয় হয়, নিজেকে ধরিবার জন্য অনেক কষ্টে অনেক যত্নে নিজেই জাল পাতিতেছে—এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণায় সময় সময় মনে মনে কিছুক্ষণ ছটফট করার মত কষ্ট পায়।

পয়সার লোভ কি একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে তাকে?

তখন সে প্রাণপণ চেষ্টায় আকাশের দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া ভাবিবার চেষ্টা করে, আহা, কেমন চাঁদ উঠিয়াছে ভাখো। মেয়েটা আসিয়া ফুটফুটে একটি ছেলে প্রসব করিয়াছিল। আয় চাঁদ আয় চাঁদ বলিয়া নাতির কপালে টিপ দিতে পারিলে মন্দ হইত না!

পীতাম্বরের কাছে শ্রীপতি পরামর্শ চাহিলে সে মাথা নাড়ে।

'না বাবু, আমি কোন পরামর্শ দিতে পারবো না। আমাকে কে পরামর্শ দেয় ঠিক নেই।'

শ্রীপতি বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করে, পীতাম্বর তার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

কারো দিকেই পীতাম্বর তাকায় না, কারো জীবনের সুখ-দুঃখ আশা নিরাশা ছোট বড় সমস্যা সম্বন্ধে তার এতটুকু আগ্রহ নাই।

নিজের কথা ছাড়া কারো কথা সে ভাবে না।

—জগতে আরো যে মানুষ আছে সে ছাড়া, শুধু এইটুকু সে জানে, আর কিছু জানিতে চায় না। তারা সকলেই ভাল মানুষ তাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ, এইটুকু তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কারো কান্না তার বুকে বাজে না, কারো হাসি তাকে খুসী করে না।

একটি মানুষের উপর এতটুকু হিংসা বা বিদ্বেষ পর্য্যন্ত তার নাই, স্বার্থপরতা তাকে এমন উদাসীন করিয়াছে।

লাবণ্য একদিন তাকে ডাকিয়া পাঠাইল। এক বাড়ীতে থাকিয়াও এক মাসের

উপর লাবণ্যকে সে চোখেও ছাখে নাই। লাবণ্য নিজেই তাকে ডাকিয়া না পাঠাইলে আরও কয়েক মাসের মধ্যে হয় তো একটিবার তার মনেও পড়িত না যে এ বাড়ীতে লাবণ্য বলিয়া কেহ আছে।

লাবণ্য তাকে খাতির করিয়া বসিতে বলে। তারই জন্ম যে চেয়ারটা আগেই এ ঘরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই চেয়ারে বসিতে বলে।

এবং পীতাম্বরও দ্বিধামাত্র না করিয়া ধীরে সুস্থে সেই চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ মা?'

'সহরে এসে শরীরটা টিকছে না।'

পীতাম্বর চুপ করিয়া থাকে।

তারপর লাবণ্য তাকে ডাকিয়া আনিয়া খাতির করিয়া ঘরে বসানোর আসল কথাটা বলে।

'আপনি তো টোটকা জানেন অনেক রকম, অনেককে সারিয়ে দিয়েছেন। আমায় দিন না একটা কিছু?'

জোরালো চিকিৎসা আরম্ভ করার পর লাবণ্যের অসুখ বাড়িয়াছে। কদিন বিছানায় পড়িয়া থাকে সে হিসাবের বদলে এখন সে হিসাব রাখে কদিন সে উঠিয়া হাটিয়া বেড়ায়।

আরেকটু সে রোগা আর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তবু তাতেই যেন লাবণ্য তার বাড়িয়া গিয়াছে। গীতিকাব্যের ছাকা অনুভূতির প্রলেপ যেন পড়িয়াছে তার রূপে, দেখিলে আরও মৃদু আরো মোলায়েম প্রত্যানুভূতি জাগে।

এ ধরণের নিষ্প্রভ মায়াবোধ্য রূপ দেখার চোখ অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতি যাদের আছে তারা বিশেষভাবে লাবণ্যকে আজ কাল ছাখে, নিশ্বাসের ঘষায় লাবণ্যের নাকের আর ঠোঁটের ছাল উঠিয়া যাইবে ভাবিয়া শঙ্কিত হয় এবং এমন একটা উপভোগ্য মমতা জাগে বৌটির জন্য প্রত্যেক সহৃদয় মানুষের যার খানিকটা প্রেমের মত।

পীতাম্বর কিছুই অনুভব করে না, লাবণ্যের অস্তিত্ব তার কাছে জলের স্বাদ গন্ধহীন হইয়া থাকে। মোহনের রুগ্না বৌটির জন্য সে কিছুমাত্র মমতা অনুভব করে না।

'টোটকা ওষুধ চাইছ? দেব বৌমা, তোমায় ভাল ওষুধ দেব। তা, অসুখটা কি তোমার?'

লাবণ্য চোখ বড় করিয়া তাকায়। তার অসুখের খবর রাখে না এমন মানুষও যে জগতে আছে এ কথা বিশ্বাস করিতেও তার কষ্ট হয়। আর এ লোকটা এতদিন এক বাড়ীতে আছে, বড় বড় ডাক্তার ডাকিয়া এত সমারোহ করিয়া তার চিকিৎসা হইল, আজ ও জিজ্ঞাসা করিতেছে তার কি অসুখ!

'এমনি অসুখ।'

'এমনি অসুখ? আচ্ছা, ওষুধ দেব। কিন্তু আমার ওষুধে তো ভাল ফল হয় না বৌমা?'

পীতাম্বরকে ডাকিয়া পাঠানোর আগে তারই মুখে শোনা তার নিজের টোটকার গুন-গান লাবণ্যের মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গ্রামের বাড়ীতে আশ্রিত জনৈক প্রজার ছোট একটি ছেলেকে ওষুধ দিতে আসিয়া তার ওষুধের গুণ ব্যাখ্যাতে এতসব বড় বড় বিশেষণ সে উচ্চারণ করিয়াছিল যে শুনিয়া তখন লাবণ্য হাসি চাপিতে পারে নাই। আজ সেই কথাগুলি মনে করিয়া হাসি পাওয়ার বদলে আশায় সে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল।

পীতাম্বরের মুখে উল্টো কথা শুনিয়া সে রাগিয়া গেল।

'যান তবে আপনি, যান।'

পীতাম্বর চলিয়া যাওয়া মাত্র সে মোহনকে ডাকিয়া পাঠাইল।

'পীতাম্বরকে যেতে বলো এ বাড়ী থেকে।'

'কেন? কি করেছে পীতাম্বর?'

'আমি ডেকেছিলাম, টোটকা ওষুধ কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে। মুখের ওপর এমন কাটাকাটা জবাব দিলে! ওই যেন বাড়ীর কর্তা।'

'ওকে তুমি জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন টোটকা ওষুধের কথা?'

'তুমি তার কি বুঝবে। আমার যন্ত্রণা বুঝি আমি।'

বলিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে লাগিল সে আত্মমমতায় স্বামীর উপর অকারণ অভিমানে, মুখে কিন্তু বলিতে লাগিল, 'অনেককাল তো আছে, এবার ওকে বলে দাও, নিজের ব্যবস্থা করে নিক। এখানে আর জায়গা হবে না। ওকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

মোহন চিন্তিত হইয়া বলিল, 'এতো মহা মুস্কিলে ফেললে। 'গ্যারেজের এক কোণে পড়ে আছে, দু'বেলা শুধু দুটি খায়, কি বলে ওকে আমি তাড়িয়ে দেব? সেটা কি উচিত হবে?'

লাবণ্য তা জানে না। হঠাৎ তার মনে একটা ভাসা ভাসা সন্দেহ জাগিয়াছে, ওই লোকটার জন্যই তার অসুখ বুঝি সারিতেছে না, আরও বেশী ভুগিতেছে। পীতাম্বর যে মোহনদের নির্ব্বংশ হইবার শাপ দিত, গ্রামে থাকিতে এ কথাও লাবণ্যের কানে গিয়াছিল। মোহনের এক বুড়ী পিসী তাকে এমন কথাও বলিয়াছিল যে পীতাম্বরের শাপেই তার ছেলেপুলে হইতেছে না— তাকে সন্তুষ্ট করিয়া সে যাতে অভিশাপ ফিরাইয়া নিয়া তাকে আশীর্ব্বাদ করে সে ব্যবস্থা করা উচিত।

মনে তখন জোর ছিল,—কলেজে পড়া, ইংরাজি সাহিত্য পড়া মনে। গ্রাম্য কুসংস্কার তুচ্ছ করিবার জন্য মোহনের তাগিদও ছিল কড়া। বুড়ী পিসীর কথাটাকে সে আমল দেয় নায়।

আজ মনে হয় অসম্ভব কি? অসুখ তার মিথ্যা নয় কিন্তু পীতাম্বরের জন্যই হয় তো তার অসুখ হইয়াছে। অসুখের জন্য অসুখ নয়, তার যাতে ছেলেপিলে না হয়, মোহন যাতে নির্ব্বংশ হয়, সেই জন্যই অসুখ। মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক্ কিসব খাটাইতেছে লোকটা কে জানে। লাবণ্য ওসব বিশ্বাস করে না, অত কুসংস্কার তার নাই, কিন্তু যদিই বা কিছু সত্য থাকে ও সমস্তের মধ্যে? তারা বোঝে না এমন কিছু যদি থাকে?

'গ্রামে থাকতে আমাদের খালি শাপ দিত মনে নেই তোমার? আমাদের সর্ব্বনাশ হোক তাই শুধু ও চায়। খারাপ মতলব না থাকলে সঙ্গে এল কেন আমাদের?—আমাদের চোখের আড়াল করবে না। গ্রামের লোকেরা বলত শোননি ওর অনেক রকম বিদ্যা জানা আছে? আমাদের ওপর কিছু খাটাবে বলে সঙ্গে এসেছে। নইলে আমায় ওষুধ দেবে না কেন বল? এদিকে আমাদের খারাপ করার জন্য ক্রিয়াট্রিয়া করছে, আমায় ভাল ওষুধ দিলে দুটো শক্তিতে বিরোধ বাধবে বলে তো?'

লাবণ্যের কথা শুনিতে শুনিতে মোহন আমোদ পায় না, অবজ্ঞার সীমা থাকে না তার। অশিক্ষিতা গেঁয়ো মেয়ে হইলেও কথা ছিল, লাবণ্য বি এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছিল, তার তিনটি ভাই বৈজ্ঞানিক, একজন প্রায় বিখ্যাত। মফস্বলের সহর হইলেও তার বাপের বাড়ী বড় সহরে—একটা ভাল কলেজ আছে, কলকারখানা আছে। বিয়ের পর তার দেশের বাড়ীতে ক'বছর থাকার সময় কি লাবণ্য এসব ধারণা সঞ্চয় করিয়াছে?

সেখানে অবশ্য অনেক দিন এমন অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছে, পীতাম্বরের অলৌকিক ক্ষমতায় যারা চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করে। ...ধূপের প্রভাবও বোধ হয় মেয়েদের উপরেই কাজ করে বেশী।

সন্ধ্যার পর হাঁটিতে হাঁটিতে সে জগদানন্দের বাড়ী গেল, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক বিশ্বাস করেন? টোটকা?'

'আপনি করেন না?'

মোহন নীরবে একটু হাসিল।

'কেন করেন না? অসম্ভব মনে হয় বলে? নাকের কাছে ক্লোরোফর্ম্ম ধরলে জ্যান্ত মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, গাঁজা আপিমের ধোঁয়া গিলে স্বপ্ন দেখা যায়, এমন তো লতাপাতা ওষুধপত্র থাকতে পারে যা খাওয়ালে বা পুড়িয়ে ধোঁয়া নাকে দিলে বিশেষ রকমের মোহ জাগতে পারে মানুষের? একটা বশীকরণের গল্প শুনেছিলাম।

ঠিক কোন দিকে বাতাস বইছে হিসেব করে একজন মাঝরাত্রে গ্রামের ধারে ফাঁকা মাঠে আগুন জ্বালিয়ে লতাপাতা পোড়াতে লাগল, আধ মাইল দূরের এক বাড়ী থেকে একটি বৌ ঘণ্টাখানেক পরে হাজির হল সেখানে। এটা হয়তো গল্প, কিন্তু সম্ভবপর গল্প তো? ঘটনাটা অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু বাতাসে গন্ধ উড়ে গিয়ে বৌটাকে মোহগ্রস্ত করে টেনে আনতে পারে, ঘুমের মধ্যে গন্ধটা তার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এটা খুব অসাধারণ হলেও অসম্ভব নয়।'

'গাঁয়ে কি বৌ ছিল একটি?'

'তা ছিল না। বৌটির শারীরিক মানসিক বৈশিষ্ট্য হিসাব করে হয়তো লতাপাতা বেছে নেওয়া হয়েছিল।'

'ওসব শুধু কল্পনায় সম্ভব। ঘটতে পারে এইটুকু বলা যায়, কখনো ঘটে না। দ্রব্যগুণে তবু কতকটা বিশ্বাস করা চলে, মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক—'

'তাতেও বিশ্বাস করা চলে। গানের সুর মনে কাজ করে। দূরে বাঁশী বাজছে, শুনে মনটা কেমন করতে লাগল। খুব কাছে গিয়ে শুনলে হয়তো কেঁদো আওয়াজে বিরক্তি বোধ হবে, কিন্তু দূর থেকে ভেসে আসছে বলে কোন কারণে ক্রিয়া[illegible] অন্যরকম। তা এমন মন্ত্র তো থাকতে পারে কানে—[illegible] লাগলেও শব্দটা ধরা যায় না, মনে কাজ হয়?'

'ওসব অনেক শুনেছি জগৎবাবু। এসব বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্ক কখনো শেষ হয় না, তর্কই থেকে যায়। আমার একটা কথার জবাব দিন তো। আমি বিশ্বাস করি না, তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নিলাম, সমস্তই সম্ভব। কিন্তু যার তার পক্ষে কি সম্ভব? গানের কথা বললেন, গান শিখতেই মানুষকে কতকাল সাধনা করতে হয়। ওসব মন্ত্রতন্ত্র শেখা নিশ্চয় আরও কঠিন? কিন্তু আপনি দেখবেন, যারা ওসব জানে বলে লোকে বিশ্বাস করে তারা অধিকাংশই অপদার্থ, হামবাগ।'

জগদানন্দ মাথা নাড়ে।

'আপনার ষ্ট্যাণ্ডার্ডে হয় তো তাই, আসলে হয়তো তারা উঁচুস্তরের মানুষ।

স্তরটা ভিন্ন বলেই ওদের হয় তো হামবাগ মনে করি। আপনার লজিকটা এক পেশে, সব দিক বিবেচনা করছেন না। আপনি ভাবছেন অপদার্থ কিন্তু তুকতাক খাটাবার বিশেষ ক্ষমতার জন্য হয় তো ওই রকম হতে হয়। আপনার আমার মত মানুষ হলে ওই বিশেষপ্রতিভা থাকে না। ফুটপাতে ফোঁটা তিলক কাটা জ্যোতিষী দেখলেই আপনার গা জ্বালা করে, আমার করে না। আপনি ভাবেন ওরা ভণ্ড, লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে, আমি তাও ভাবি না। আপনার মাপকাঠিতে বিচার করলে হয়তো সত্যসত্যই এক নম্বরের ভণ্ড, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, আমি ওই মাপকাঠিটাই মানি না। ওদের ওই ভণ্ডামিই হয়তো সত্য, আমরা যে সদা সত্যকথা বলি সেটাই হয়তো মিথ্যা। ওরা যে বিদ্যার ভাণ করে সে বিদ্যাটা হয়তো জানে না, কিন্তু বিদ্যাটায় বিশ্বাস করে। আমরা কিছু বিশ্বাস করি না, লোকে মিথ্যাবাদী বলবে ভয়ে সত্য কথা বলি, চলতি সত্য কথা মানুষের সঙ্গে মানুষের মতের অমিল লক্ষ্য করেছেন, কত বিষয়ে কতরকম অমিল? ওটা হল অবিশ্বাসের প্রমাণ। আমরা চোখ খুলে জানবার চেষ্টা করছি এবং বিশ্বাস অন্ধ এই অজুহাতে আমরা বিশ্বাস ত্যাগ করেছি। যন্ত্রের মত আমরা অবিশ্বাস করে যাই। বিশ্বাসী ভণ্ডরা যদি নেগেটিভ অপদার্থ নেগেটিভ হামবাগ হয়, আমরা পজিটিভ অপদার্থ, পজিটিভ হামবাগ।'

মোহন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করে, 'আপনি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন?'

জগদানন্দ মৃদু হাসিয়া বলে, 'না। আমিও তাই ভাবছিলাম—আমার কথা শুনে আপনি হয় তো মনে করেছেন আমি অলৌকিকে বিশ্বাসী। আমি এতক্ষণ বললাম আমাদের একপেশে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের এখনকার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে যা অসম্ভব মনে হয়, তাই আমরা অলৌকিক বলে উড়িয়ে দিই। একটা ব্যাপার কেন ঘটে কিভাবে জানি না বলেই কি সেটা অলৌকিক হয়ে যাবে, ভুতুড়ে ব্যাপার বলে বাতিল হয়ে যাবে? একদিন হয় তো জানা যাবে ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুত কিছু নয়, বাস্তব নিয়মেই ঘটে থাকে।'

কিন্তু বিজ্ঞানকে ডিঙিয়ে কোন মাপকাটিতে তবে বিচার করব? বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে কোন যুক্তিতে সেটা সম্ভব ভাবব?

'আপনি আমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছেন না। আমি বিজ্ঞানকে ডিঙিয়ে যেতে বলি নি। বিজ্ঞান যা অসম্ভব বলছে সেটা অসম্ভব বলে মানতে হবে বৈ কি! কিন্তু বিজ্ঞান আন্দাজে কোন কিছুকে অসম্ভব বলে না, কেন অসম্ভব তার অকাট্য বাস্তব বাখ্যাও দেয়। কিন্তু আজও বিজ্ঞানের অনেক কিছু অজানা আছে—আজও নানা আবিষ্কারের মধ্যে বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে। আজও বিজ্ঞান যা কিছু বাখ্যা করতে পারে না সেটাকেই আমরা অলৌকিক অবাস্তব ভাবব কেন? জগতে সবই যখন বাস্তব, চিন্তায় অবাস্তবের অলৌকিকের ফাঁকি থাকবে কেন? ম্যাজিক দেখে তো আমরা ভাবি না অলৌকিক কিছু ঘটছে। বাস্তব জগতে দুর্বোধ্য কিছু ঘটলে হয় ভাবব অলৌকিক, নয় একেবারে উড়িয়ে দেব।'

মোহন বিব্রত বোধ করে। জগদানন্দ ঠিক গুরুর মতই কথা বলিতেছে।

জগদানন্দ তার মুখের ভাব দেখিয়া নিজের মুখে হাসি ফুটাইয়া বলে, তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের কথা বাদ দিন না। ভালবাসার কথাই ধরুন। বিজ্ঞান আজও বলতে পারে না ভালবাসাটা ঠিক কি ব্যাপার। বিজ্ঞান বলছে প্রেম কবির ফাঁকা কল্পনা নয়, মানুষের প্রেম বাস্তব ব্যাপার। পশুপাখীর যৌন ব্যাপারের মতই মানুষেরও যৌন ব্যাপার—নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করা আর বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাওয়া। মানুষের যৌন ব্যাপারে আরেকটা বাড়তি বাস্তব ব্যাপার আছে—প্রেম। কাব্যে সাহিত্যে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রঙ দিয়ে এই বাস্তব রহস্যটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়ে আসছে। ফেণা আর রঙটা বাখ্যা করে বাতিল করে যৌন বিজ্ঞান প্রেমের মানে বোঝাতে চেয়ে পারে নি। শরীর বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যৌন বিজ্ঞান, প্রেমের এদিক ওদিক সেদিকটা বুঝিয়েছে, প্রেমকে বোঝাতে পারে নি।'

'বিজ্ঞান প্রেমকে বাস্তব ব্যাপার বলে নাকি?'

'বলে বৈকি। কাব্য সাহিত্যে প্রেমের ভাববাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়।

বিজ্ঞান বলে, দেহ আর মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়া প্রক্রিয়া হল প্রেম। ওটা কেন আর কি ভাবে ঘটে বিজ্ঞান সঠিক বলতে পারে না। আজ পারে না, একদিন নিশ্চয় পারবে।'

রাত্রে ইজিচেয়ারে চিৎ হইয়া মোহন একটি বিলাতী ম্যাগজিনে গল্প পড়িতেছে, গল্পটির শেষে পাওয়া গেল একজন বিখ্যাত যাদুকরের সচিত্র প্রবন্ধ।

কয়েকটি অলৌকিক অবিশ্বাস্য পুরাণো ম্যাজিক কিভাবে দেখানো হয় তার সাধারণ বোধগম্য লৌকিক ব্যাখ্যা ও বিবরণ আছে। একজন পৃথিবী বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক সম্পর্কে একটি গল্পও আছে।

অনেক দিন আগে নিজের বোনের সহযোগিতায় যাদুকর একটি অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাইয়াছিলেন, দার্শনিক উপস্থিত ছিলেন। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সেই খেলাটি দেখিতে দেখিতে বার বার দর্শকদের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল, তিনজন মহিলা মূর্ছা গিয়াছিলেন।

"ম্যাজিক দেখানোর শেষে যাদুকর বলিয়া দিয়াছিলেন তাঁর খেলায় অলৌকিক কিছুই নাই, আগাগোড়া সবটাই কৌশল। কিন্তু খেলাটি শেষ হওয়া মাত্র দার্শনিক উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত তুলিয়া প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের চুপ করাইয়া আবেগ কম্পিতকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, যাদুকর যাই বলুন, তিনি বিশ্বাস করেন না অলৌকিক শক্তির সাহায্য ছাড়া এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে। যাদুকরের ভগিনীর নিশ্চয় কোন অজ্ঞাত অশরীরী ক্ষমতা আছে।

"ব্যবসার খাতিরে সেদিন যাদুকরকে চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এত দিন পরে সেই ম্যাজিকের ফাঁকিটা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশ্বাস? ম্যাজিকের ফাঁকি তুচ্ছ হইয়া যায়, প্রেক্ষাগৃহে দার্শনিকের কাল্পনিক মূর্তি আর শত শত দর্শকের মুখ ফিরাইয়া তার কথা শুনিতে শুনিতে রোমাঞ্চ অনুভব করার দৃশ্যই মোহনের কল্পনায় জাগিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের কথাই কি জগদানন্দ বলিয়াছিল? ভুল হইলেও যা বিশ্বাসের জোরে ঠিক, মিথ্যা হইলেও যা বিশ্বাসের জোরে সত্য, যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধেও যা টিকিতে পারে?

লাবণ্য কি সত্যই বিশ্বাস করে পীতাম্বরের জন্য তার অসুখ সারিতেছে না, বাড়িতেছে ?

কি সঙ্কীর্ণ মন লাবণ্যের ! জগদানন্দের মতে হয়তো অন্ধ অবিশ্বাসের চেয়ে কুসংস্কারের এই বিশ্বাসও ভাল। মোহনের মনটা খুঁত খুঁত করে। সৎ উদাত্ত অন্ধ বিশ্বাস হইলেও কথা ছিল, নিজের ভাল মন্দের হিসাবে ভীরুমনের এই হীন স্বার্থপর বিশ্বাস !

চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া লাবণ্য তার কপালে হাত রাখে।

'একলাটি ভাল লাগছে না।'

'উঠে এলে যে ?'

'উঠব না ? খালি শুয়ে থাকব ?'

লাবণ্যের এ ভাবটা মোহনের জানা। তার হাল্কা ছেলেমানুষী ভাব আসিয়াছে। এখন হাসিও যত সহজ, কান্নাও তেমনি। তবে এ অবস্থায় রাগ আর বিরক্তির ঝাঁঝটা তার থাকে না।

'পীতাম্বরকে কাল চলে যেতে বলব লাবু।'

পীতাম্বরের কথা লাবণ্যের মনেও ছিল না। মোহন না বলিলে আর হয়তো সে তাকে তাড়ানোর কথা কোনদিন বলিত না।

'থাকৃগে কাজ নেই। এতলোক তোমার ঘাড়ে খাচ্ছে. ওকে তাড়িয়ে আর কি হবে !'

অবাক হওয়ার উপায় নাই। একরাশি দিনরাত্রি লাবণ্যের সঙ্গে কাটিয়াছে। জানিতে কি আর বাকী আছে যে এমনিভাবে বদলানোই তার প্রকৃতি !

মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক খাটাইয়া পীতাম্বর তাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে ভাবিয়া লাবণ্য যখন গেঁয়ো মেয়ের মত লোকটাকে তাড়াইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল তখন হয় তো তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে এই লাবণ্যই আবার আধা সহুরে কলেজে পড়া মেয়ের মত গ্রাম্যভাবের ঝোঁকটা কাটাইয়া

উঠিয়া ওই পীতাম্বরের টোটকা ওষুধের লোভ এবং তার মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের ভয় তুচ্ছ করিয়া উদারভাবে লোকটাকে ক্ষমা করিবে।

চিরদিন এমনি করিয়া আসিয়াছে।

শুধু এই ব্যাপারে নয়। অনেক ব্যাপারে।

পীতাম্বরকে তাড়ানোর প্রশ্ন যেন চুকিয়া গিয়াছে এমনিভাবে লাবণ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা মা যে বলে ছেপেপিলে হলে আমি সেরে যাব, তাকি সত্যি ?'

'অনেকের সেরে যায় শুনেছি। যেতে বলব না পীতাম্বরকে ?'

লাবণ্য ইতস্ততঃ করিয়া বলে, 'থাক এখন।'

কিন্তু মোহন এখন ভাবে, কাজ কি ? লাবণ্যের মনে যখন একবার ওরকম খুঁত খুঁতানি আসিয়াছিল, কি দরকার পীতাম্বরকে বাড়ীতে রাখিয়া ? আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, চিরদিন ওকে আশ্রয় দানের প্রতিজ্ঞাও সে করে নাই। ওকে এবার যাইতে বলাই ভাল।

মনে মনে হয়তো লোকটা সত্যই তার সর্ব্বনাশ কামনা করে। গ্রামে সে মুখেও তাই বলিয়া বেড়াইত, অনেকের কাছেই মোহন শুনিয়াছে। ওকে আর থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।

না, লাবণ্যের খাপছাড়া ধারণায় সে বিশ্বাস করে না। ক্রিয়াকলাপ তুকতাক মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে কেউ কারো ক্ষতি করিতে পারে, তাও পীতাম্বরের মত লোক, এই হাস্যকর ধারণায় মোহন কখনো ভয় পাইতে পারে ?

তবু, কাজ নাই তার লোকটাকে ঘরে ঠাঁই দিয়া। এ জগতে কিসে কি হয় কে তা বলিতে পারে ?

ভোরবেলাই মা কিন্তু তাকে আবার ধাঁধাঁয় ফেলিয়া দিলেন।

পীতাম্বরকে তাড়াইবার সম্বন্ধে ঢিল পড়িয়া গেল, পীতাম্বর রীতিমত একটা সমস্যা হইয়া উঠিল তার চেতনায়।

মোহন ভোরের চা খাইতেছিল—আবছা ভোরে শুধু এককাপ চা। ছেলেবেলা হইতে বাবা চিরদিন ডাকিয়া তুলিতেন রাত্রির আঁধার ম্লান হইতে সুরু করা মাত্র। গ্রামের সংসারের একাংশ সহরে আনিয়া বাসা বাঁধিয়া সহরের জীবনের সঙ্গে এত অল্পদিনে মানাইয়া ফেলিয়াও সে বিছানায় শুইয়া সূর্য্যোদয় ঘটিতে দিতে পারে না।

দামী খাটের আধুনিক শয্যা যেন কামড়ায়।

মা ইতিমধ্যেই স্নান সারিয়াছেন।

মা বলিলেন, 'লাবু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়াতে চাইছে। তুই কি ঠিক করেছিস জানিনে। কিন্তু পীতাম্বর ঠাকুরকে তাড়ানো কি উচিত হবে?'

'উচিত হবে না কেন? চিরকাল ওকে পুষব বলে তো আনি নি? পয়সা রোজগার করছে, এবার নিজের পথ দেখুক।'

আপশোষের আওয়াজ করিয়া মা বলেন, 'তুইও বৌমার মত এলোমেলো চিন্তা করিস। তুই না তুকতাকে বিশ্বাস করিস না? লাবু বলল তুকতাক করে মানুষটা আমাদের সর্ব্বনাশ করছে—তুইও ওমনি ওকে তাড়াতে রাজী হয়ে গেলি? বৌমা যে উল্টো বুঝেছে, ছেলেমানুষী করছে এটা বুঝলি নে তুই? ওনাকে অপমান করলে তাড়িয়ে দিলেই যে সর্ব্বনাশ হবে আমাদের।' ওভাবে ক্ষতি করতে চাইলে শত্রুভাবে করতে হবে তো? তোর বাড়ীতে থেকে তোর অন্ন খেয়ে তোর সর্ব্বনাশের জন্য তুকতাক চালাতে গেলে পীতু ঠাকুর নিজেই মারা পড়বে না?

লাবণ্য তবে নিজের উদারতায় পীতাম্বরকে ক্ষমা করে নাই, মা'র যুক্তি শুনিয়া ভয় পাইয়াছে।

পরদিন সকালেই তাই সে পীতাম্বরকে বলিল, 'একটা ভারি মুস্কিল হল যে পীতুকাকা! গ্যারেজের এই ঘরটা যে আমার দরকার হবে।'

পীতাম্বর বলিল, 'তা আর মুস্কিল কি; সিঁড়ির নীচে কোণের দিকে যে ঘরটা আছে আমি বরং সেখানে যাই?'

সেটা ঠিক ঘর নয়, তিনহাত চাওড়া পাঁচহাত একটা ঘুপচি, জানালার বদলে উঁচুতে একটি ছোট ফুটা আছে, ফেলিয়া দিতে মায়া হয় অথচ কাজে লাগে না এমনি সব আবর্জ্জনাই রাখা চলে।

'ও ঘরটাও কাজে লাগবে।'

পীতাম্বর চাহিয়া থাকে।

'আপনি বরং অন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নিন।'

পীতাম্বরের মুখ দেখিয়া মোহনের মায়াও হয়, লজ্জাও করিতে থাকে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে বলিয়া বসে, 'তাড়াতাড়ি কিছু নেই, দশপনের দিন আরও থাকতে পারবেন। সুবিধামত ব্যবস্থা করে না নিতে পারলে আমি কি আপনাকে তাড়িয়ে দেব? দেখেশুনে সুবিধামত জায়গা খুঁজে নিয়ে গেলেও চলবে।'

দশপনের দিন সময় দিয়াছে। তার মানেই অন্ততঃ এক মাসের আগে লোকটা নিশ্চয় নড়িবে না।

মোহন মনে মনে আপশোষ করিতে লাগিল। পীতাম্বরকে বাড়ীতে রাখিবে না ঠিক করিবার পর অবিলম্বে তাকে তাড়ানোর জন্য তার কেমন একটা খাপছাড়া ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে। এতদিন সে আছে, যার থাকা অথবা যাওয়ার কথা এতদিন সে একবার চিন্তাও করে নাই, এখন আরও পনেরটা দিন সে থাকিবে ভাবিলেই তার অস্বস্তির সীমা থাকিতেছে না।

সারাদিন মোহন এই কথাটাই মনে মনে নাড়াচাড়া করিল, রাত্রে পীতাম্বর ফিরিলেই তাকে জানাইয়া দিবে কিনা, কাল পরশুর মধ্যেই তার যাওয়া চাই। তারপর রাত দশটার সময় খোঁজ নিতে গেল পীতাম্বর ফিরিয়াছে কিনা।

শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে জানাইল, পীতাম্বর তার যা কিছু ছিল পুঁটলী বাঁধিয়া সকালেই চলিয়া গিয়াছে।

'ওনা কি করেছেন বাবু?'

'কিছু করে নি।'

একবার বলিয়া গেল না ?

এত তেজ পীতাম্বরের ? এতদিন তার আশ্রয়ে থাকিতে পারিল, তার অন্ন ধ্বংস করিতে পারিল, যাওয়ার সময় একবার বিদায় নিয়া যাইতে পারিল না ? বলা মাত্র গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল ?

এরকম অকৃতজ্ঞই হয় বটে এসব অপদার্থ মানুষ।

পীতাম্বর কিছু ফেলিয়া যায় নাই, কাগজের একটি টুকরাও নয়। ফেলিয়া যাওয়ার কিছুই তার ছিল না। কোন চিহ্নই সে রাখিয়া যায় নাই।

যে স্থানটুকু মাত্র কয়েকমাস সে দখল করিয়াছিল সেদিকে চাহিয়া শ্রীপতির বুক অনিশ্চিত আশঙ্কায় দুরু দুরু করে।

কে জানে মোহন কবে তাকেও দূর করিয়া দিবে।

থাকা আর খাওয়ার জন্য পয়সা খরচ করিতে হইলে কদমকে তার আর টাকা পাঠানো হইবে না, দুটি চারটি টাকার বেশী নয়। কদমের মুখের হাসি মিলাইয়া যাইবে, একটু নির্ভাবনায় থাকিয়া আর পেটে দুটো খাইয়া তার চেহারায় যে জলুষ আসিয়াছে তার চিহ্ন থাকিবে না, মা-মরা ছেলেমেয়েগুলিকে খুসী মনে আদর যত্ন করার বদলে আবার গায়ের জ্বালায় দিশা হারাইয়া তিন হাতাড়ি পিটাইতে আরম্ভ করিবে।

না, আর দেরী করা নয়।

আয় বাড়ানোর জন্য কোমর বাঁধিয়া এবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। দুর্গার পিছনে আর একটি পয়সা খরচ করা চলিবে না। নিজের খরচ আরও কমাইতে হইবে—কোন রকমে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য যা দরকার তার অতিরিক্ত সব কিছু ছাটিয়া ফেলিতে হইবে—বিড়ি খাওয়া পর্যন্ত।

রোজগারের কি ব্যবস্থা করিবে ?

হাতাখন্তি দা' কুড়ুল গড়া ছাড়া কিছুই সে যে জানে না। জগদানন্দের দয়ায়

কারখানায় কাজ পাইয়াছে, প্রথম দিকে কাজের কিছুই বুঝিত না, ক্রমে ক্রমে কাজ শিখিয়াছে। কারখানাতে কাজ না করিলে এ শিক্ষার কোন দাম নাই। জগদানন্দের খাতিরে প্রথম হইতেই ভাল মজুরি কাজ সুরু করিয়াছে। তাতে শেষ পর্য্যন্ত লাভ হয় নাই। কাজ শিখিলেও সহজে তার কাজ পাকা করা হইবে না, বেতন বাড়িবে না। কারখানায় কাজ না করিয়া অন্য কিছু সে যদি করিতেও চায়, লোচনের মত ছোটখাট একটি নিজস্ব মেরামতি কারখানা খোলে, ফণীর মত ভাঙ্গা লোহালকড় কেনা বেচা করে,—টাকা কই তার ?

টাকা ?

দেশে এক বিঘা জমি আছে। দু'খানা ভাঙ্গা ঘর আছে। কদমের গায়ে একটু সোনা আছে। আর আছে হাপর নেহাই হাতুড়ি সাঁড়াশীগুলি। ওসব বেচিয়া দিলে কিছু টাকা হয় না ?

কাজের শেষে কারখানার বাহিরে আসিয়া খাটুনির চেয়ে দুশ্চিন্তায় শ্রীপতি বেশী শ্রান্তি বোধ করে।

বিড়ি খাইতে বড় ইচ্ছা হয়। বিড়ি সে কেনে নাই, দু'টি একটি চাহিয়া খাইয়াছে। কিনিবে না করিতে করিতে এক পয়সার বিড়ি সে কিনিয়া বসে।

শুধু একটি পয়সা। কি আসে যায় একটি পয়সাতে ?

বিশেষতঃ আর কোনদিন যখন কিনিবে না, আজই তার শেষ বিড়ি কিনিয়া খাওয়া। বিড়ি না খাইয়া একটা পয়সা বাঁচানো আরম্ভ করা একটা দিন শুধু পিছাইয়া গেল।

মোটে একদিন।

দুর্গার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিবে কি ?

শেষ দেখা ?

দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দেওয়াও একটা দিন পিছাইয়া দিলে খুব বেশী কি আসিয়া যাইবে ?

কিছু ভাল লাগিতেছে না, কেমন অস্থির অস্থির করিতেছে মনটা তার। দুর্গার

কাছে গেলে কি এখন ভাল লাগিবে? দুর্গার শান্ত ঘরোয়া ব্যবহার প্রথমটা শ্রীপতির বড়ই পছন্দ হইয়াছিল, এখন কেমন যেন ভোঁতা মনে হয় তাকে। দুর্গার সরল সহজ কথা আন্তরিক সহানুভূতি আর তেমন মিঠা লাগে না।

কারখানার ভিতরের গরমের পর বাহিরের শীতে কাতর হইয়া ঘরের কোণে জড়সড় হইয়া শ্রীপতি বসিয়া থাকে, এমন অসহায়, এমন অকর্মণ্য মনে হইতে থাকে নিজেকে, এমন অর্থহীন হইয়া যায় বাঁচিয়া থাকা!

টাকার জন্য প্রাণপাত করিতে সে রাজী, তার কোন সুযোগ নাই। কদমকে ছাড়িয়া দিন কাটে না, তাকে কাছে রাখা চলে না। বিড়ি খাইতে ভাল লাগে, বিড়ি কেনা বন্ধ করিতে হয়।

কারখানায় কাজ আরম্ভ করিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছে দয়া করিয়া তাকে কাজ দেওয়া হয় নাই, তাকে খাটাইবার জন্য কর্ত্তাদের আগ্রহের সীমা নাই।

তাকে বেশী বেশী খাটিবার সুযোগ দিয়া তাকে খাটাইতে পারিয়াই যেন তারা বর্তিয়া যায়!

ভাগ্য যেন পরিহাস জুড়িয়াছে তার সঙ্গে।

এর চেয়ে গ্রামে থাকাই তার ভাল ছিল! যা জুটিত তাই খাইত, না হাসিলেও কদম কাছে থাকিত, এত সব দুশ্চিন্তার ধারও ধারিতে হইত না।

ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতির মরিয়া হওয়ার প্রেরণা জাগে।

কেন এত ভাবনা? কি হইবে নিজেকে এমনভাবে কষ্ট দিয়া? খেয়ালমত যা খুসী সে করুক না কেন? যা ইচ্ছা করুক কদম, কদমের জন্য তাকে এরকম যেমন খুসী খাটানোর নিয়ম সে মানিবে না। এভাবে খাটিবে না। কারো তোয়াক্কা না রাখিয়া বাঁধা নিয়মে খাটিয়া যা রোজগার করিবে এক পয়সাও সে তাকে পাঠাইবে না, রোজগারের সব টাকা খরচ করিবে নিজের জন্যে, ফুর্ত্তি করিয়া দিন কাটাইবে।

ভবিষ্যৎ ভুলিয়া মজা করার চেয়ে মজা আর কি আছে! মজুরি পাইয়াছে পরশু, এখনো কদমকে পাঠানো হয় নাই। দু'একদিনের মধ্যে মোহনের কর্ম্মচারী

দেশে যাইবে, তার সঙ্গে পাঠাইবে ভাবিয়া রাখিয়াছে। কদমের জন্য টাকা না রাখিয়া জ্যোতি আর মদনকে সাথী করিয়া সে যদি দুর্গার কাছে যায়, চাঁপাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে, একেবারে গোটা একটা দেশী মদের বোতল কেনে আর হৈচৈ করে সারারাত ?

না, দুর্গার ঘরে ফূর্তি জমিবে না।

দুর্গা চাঁপার মত নয়, গেলাসে চুমুক দেওয়ার বদলে সে শুধু ঠোঁটে ঠেকায়। অনর্গল হাসি তামাসা ছলনা চাতুরীর উল্লাসে বিশ্বসংসার ভুলাইয়া দেওয়ার বদলে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকে, উত্তেজনা ঠাণ্ডা করিয়া দেয়।

'দুগ্‌গা যেতে বলেছে দাদা।'

জ্যোতি তাগিদ জানায়।

তা বলিবে বৈকি, দুর্গা কি আর খবর রাখে না কবে সে মজুরি পাইয়াছে। আট দশ দিন খোঁজও নেয় নাই, এখন একেবারে তার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।

মন ভুলাইতে না জানুক দুর্গা পয়সা চেনে।

না, ফূর্তি করা নয়, দুর্গার সঙ্গে সে আজ ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিবে। আজ সে যাইতেছে বটে, কিন্তু সব সম্পর্ক দুর্গার সঙ্গে চুকাইয়া দিয়া আসিবে, কোন দিন যাতে আর যাইতে না হয়।

'আসো না কেন বল দিকি ? কি হয়েছে তোমার ?'

ময়লা চাদরে ঢাকা শ্রীপতির হাতুড়ি পেটা শক্ত সুন্দর শরীরটা দুর্গা দেখিতে পায় না, তাই গায়ে পিঠে হাত বুলায়। এখানে ওখানে টিপিয়া স্প্রিং-এর মত মাংসপেশীগুলি অনুভব করিতে দুর্গার ভাল লাগে।

'পয়সাকড়ি নেই, আসব কি !'

'তোমার সঙ্গে আমার বুঝি শুধু পয়সার সম্পর্ক ? তেমন মানুষ আমি নই গো, নই !'

'নিতে তো ছাড় না।'

'দিয়েছ, নিয়েছি। কেড়ে নিয়েছি তোমার ঠেঁয়ে?'

'কেড়ে নেবে কেন, তক্কে তক্কে থাকো কবে মজুরি পাব! অমনি ডাক পড়ে। কেড়ে নেয়ার চেয়ে ভাল নিতে জানো তুমি।'

দুর্গা আহত হইয়া ঘাড় কাত করিয়া বলে, 'না নিলে খাব কি? খেয়ে পরে বাঁচতে হবে না আমার?'

তারপর ঝগড়ার ভঙ্গিতে মুখটা সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলে, 'কত দিয়েছ যে শোনাচ্ছ এমনি করে? ভাসিয়ে দিয়েছ দিয়ে দিয়ে। আমি তাই চুপ করে থাকি, ভাবি আসবে যাবে মায়া জন্মাবে, নিজে থেকে দেবে—আমি কেন চাইতে যাব! নইলে দশ গুণ আদায় করতাম তোমার ঠেঁয়ে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, দেনা পাওনার হিসাবে দুর্গা এ পর্য্যন্ত শুধু ঠকিয়াছে। আর কেউ হইলে তাকে ঘরে ঢুকিতে দিত না। শ্রীপতির যেন মনেই ছিল না এটা দোকান, এখানে দাম দিতে হয়। দুর্গা আসিতে বলে তাই সে আসে বটে, কিন্তু কেউ তাকে বাঁধিয়া আনে না। দাম দিতে কষ্ট হইলে না আসিতে তার কোনই বাধা নাই!

ঝগড়া হইল এই পর্য্যন্ত, দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কি একটা ঝগড়াই শ্রীপতি কল্পনা করিয়াছিল,—জ্যোতি আর চাঁপার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন হয়। ওদের একটি ঝগড়া সে দেখিয়াছে। তীক্ষ্ণ তীব্র অশ্রাব্য সব কথা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয়, ভাবা যায় না এ জীবনে কোনদিন একজন অরেকজনের মুখ দেখিবে।

আজ তাদের দু'জনের প্রয়োজনীয় ঝগড়াটা যেন আরম্ভ হওয়ার আগেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

তাই বটে, চাঁপা অনেক দিন এ লাইনে আছে, চাঁপার সঙ্গে কোন বিষয়েই পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা দুর্গার নাই।

দুর্গা মুখ ভার করিয়া বলে, 'রাগ করো না বাবু। ঝগড়াঝাঁটি আমার

সয় না। সাধ না গেলে একটি পয়সা তুমি আমায় দিও না। আজ পর্য্যন্ত চাই নি, কখনো চাইবো না।'

'তোমার চলবে কিসে?'

'তুমি চালাবে। পাষাণ নও তো তুমি, মানুষ। খেতে পরতে পাই না দেখলে সইবে তোমার? আজ না দাও, একদিন যেচে তুমি আমায় কাপড় দেবে, গয়না দেবে। নেব না বললে বরং রাগ হবে তখন। সেদিন আসুক, আমি চুপ করে আছি।'

কদমের সতীনের মত যেন কথা বলে দুর্গা, তার বিয়ে করা বৌ-এর মত। এই তবে মতলব দুর্গার, আগে তাকে মায়ার বাঁধনে বাঁধিবে, তারপর ভাগ বসাইবে কদমের পাওনায়?

দুর্গা চা আনিয়া খাওয়ায়, গা ঘেঁষিয়া বসে, হাই তুলিয়া হাসে, বলে যে অন্য ঘরে একজনের অসুখের জন্য দু'রাত জাগিয়াছে। শ্রীপতির হৃদয়ে সুরু হয় মোহ আর ভয়ের লড়াই, দুর্গাকে সে দুহাতে বাঁধিতে চায় আর তারই মধ্যে অনুভব করে দুর্গার বাঁধন। দিন দিন তারই মোহকে জোরালো করিয়া দুর্গা তার বাঁধন শক্ত করিবে, তাকে বশে রাখিবে।

দুর্গাকে আজ তার মনে হয় শোনা গল্পের সেই রহস্যময় দেশের নারী, যে দেশের মেয়েরা বিদেশী পথিককে বশ করিয়া রাখে, পথিক আর দেশে ফেরে না।

দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দিতে আসিয়াছিল, ঝগড়াটা না জমিলেও সম্পর্ক সত্যই চুকিয়া গেল।

নিজের সব ভার তার উপর ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, আর কি তার ধারে কাছে ঘেঁষিতে পারে শ্রীপতি?

একা কদমের ভার সে বহিতে পারে না, দুর্গার ভার নেওয়ার ক্ষমতা সে কোথায় পাইবে? একটির পর একটি রাত্রি কাটে, জ্যোতি আসিয়া দুর্গার তাগিদ জানায়, জীবনব্যাপী বিরহ কল্পনার প্রথম দিকের ঘনীভূত বিষাদ বিষের মত শ্রীপতিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে।

একটিবার, শেষবারের জন্য শুধু একটিবার দুর্গার সঙ্গে দেখা করিয়া আসার কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীপতি ছটফট করে। দুর্গা সস্তা ছিল, দাম বাড়িয়াছে। তাকে বশ করিয়া শাড়ী গয়না আদায় করার মতলব দুর্গার শুধুই মতলব, তাকেও দুর্গা চায়। শ্রীপতিকে একজন চায়, সিংপুরের হাতুড়িপেটা গেঁয়ো কামার শ্রীপতিকে, মজুর শ্রীপতিকে!

জাগিয়া জাগিয়া কল্পনার স্বপ্নে তো নয়ই, ঘুমের স্বপ্নেও কোনদিন এমন ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

কদমকে সে চায়, মনে প্রাণে চায়, কিন্তু কদম তাকে চায় কিনা তা সে জানে না। কদম কোনদিন জানিতে দেয় নাই। চিরদিন সে-ই কদমকে চাহিয়া আসিয়াছে এবং বিয়ে করা বৌ বলিয়া সংসারের নিয়মে কদম তার চাওয়ার মান রাখিয়াছে।

শ্রীপতির জীবনে দুর্গাই এ জগতের প্রথম এবং একমাত্র নারী তাকে যে পুরুষের সম্মান দিয়াছে।

তার কাছে দুর্গা তাই হইয়া উঠিয়াছে রাজার কাছে রাজ্যের মত দামী। রাণীর জন্য রাজার রাজ্য ত্যাগ করার মতই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কদমের জন্য দুর্গাকে ছাঁটিয়া ফেলা।

জ্যোতির মারফতে দুর্গার তাগিদ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া আপনা হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। জ্যোতি আসিয়া আর বলে না যে দুর্গা তাকে যাইতে বলিয়াছে।

শুধু এই তাগিদটুকুর জন্য কয়েকদিন শ্রীপতি উৎসুক হইয়া রহিল, কখন জ্যোতি আসিয়া বলিবে যে দুর্গা ডাকিয়াছে।

তারপর, জয়ী পুরুষের গর্ব্ব আর তেজের অনুভূতি নিস্তেজ হইয়া আসিল, চোখে দেখার চেয়ে দুর্গাকে কল্পনায় স্পষ্টতর দেখার দৃষ্টি হইয়া আসিল ঝাপসা।

দুর্গাকে চাহিয়া শ্রীপতি আর রাত জাগে না, দুর্গাকে চাহিয়া মাঝরাত্রে আর তার ঘুম ভাঙ্গে না।

শুধু থাকিয়া গেল একটু জ্বালা আর একটু মন কেমন করা—মৃদু এবং স্থায়ী। একটা বড়রকম অসুখ হইয়া কিছুদিন পরে যেন সারিয়া গিয়াছে কিন্তু আগের মত সুস্থ হইতে পারিতেছে না।

নিছক মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া নয়। মানুষটাই সে বদলাইয়া গিয়াছে।

আগের মত আর সে বিচলিত হয় না, তুচ্ছ কারণেও নয়, বড় কারণেও নয়। পীতাম্বরের মত তাকেও মোহন তাড়াইয়া দিতে পারে, এ চিন্তায় আর আতঙ্ক জাগে না। কদমকে কাছে আনিয়া রাখিতে ছ'মাস এক বছর বিলম্বের সম্ভাবনা আর তেমনভাবে কাতর করে না। আজকালের মধ্যে বড়লোক হওয়া যাইবে না বলিয়া দিশেহারা হতাশ কল্পনা নিয়া সে টাকা করার উদ্ভট অসম্ভব ফন্দিফিকিরের জাল বোনে না। কিসে কি হয় কে বলিতে পারে?

দেখা যাক কি হয়।

পুরুষমানুষ কারখানায় খাটিয়া খায়, কি আছে তার যে হারাইবার ভয়ে কাবু হইয়া থাকিবে?

শ্রীপতি আজকাল এমনিভাবে ভাবে।

একটা ধীর শান্ত বেপরোয়া ভাব জাগিতেছে। ধরিতে গেলে সে তো সর্ব্বত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী!

তার কিসের ভয়, কিসের ভাবনা? কদম ছিল অভ্যাস। নিছক অভ্যাস। পুরুষানুক্রমিক একটা নেশা।

কদমের জন্যই দুর্গার মোহ সে জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিয়াছিল—কদমকে বাদ দিয়া দিন কাটাইতে কাটাইতে তার জন্য ছটফটানিও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

দুর্গার মত কদমও মনের মধ্যে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া একটু মন কেমন করে, আর কিছু নয়।

নেশা কাটিয়া আসিয়াছে। আর সে পাগল হইবে না কদমের জন্য। দেশের

ওই কদমের অভ্যাস কদমের নেশায় হঠাৎ ছেদ পড়ায় পাগল হইয়া আর তাকে ছুটিতে হইবে না কদমের প্রতিনিধি অন্য কোন চাঁপা বা দুর্গার কাছে!

দেহ মনে একটা অদ্ভুত শান্ত দৃঢ়তা ও তেজ অনুভব করে শ্রীপতি।

পুরাণো নেশার ঘোর কাটিয়া যাইতেছে, পচা বাঁধন খসিয়া পড়িতেছে—সে মুক্তি পাইতেছে প্রতিদিন।

নূতন জীবনের স্বাদ গন্ধও মিলিতেছে।

জ্যোতির সঙ্গে আর তেমন তার বনিবনা নাই। নূতন সাঙাৎ জুটিয়াছে।

কারখানায় তার সহকর্মী ভূপাল। জ্যোতির সঙ্গে কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল সাঙাতি আর ভূপালের সঙ্গে কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে আঁতাতি!

কাজে ভর্ত্তি হইয়া শ্রীপতি ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে কাজ শিখিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিত, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিত না সে গেঁয়ো কামার।

সহকর্ম্মীদের চালচলন কথাবার্ত্তা প্রায় কিছুই বুঝিত না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার কোন চেষ্টাই করিত না। কোন রকমে শুধু মানাইয়া চলিত।

এদের সঙ্গে উদয়াস্ত খাটিবে, কাজের জন্য দরকারী সম্পর্ক রাখিবে কিন্তু এই সব সহুরে পাকা ঝানু মজুরের সঙ্গে তার কি সমঝাওতা করা চলে।

সহুরে সাঙাৎ জ্যোতি। মোহনের বাড়ীর চাকর হইয়াও ফর্সা হাফসার্ট আর ধুতি পরে, পায়ে স্যাণ্ডেল দেয়, পাঁচীর ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া মদ খাওয়ায় গান শোনায়—শ্রীপতি বুঝিয়া উঠিতে পারিত না কোন ভাগ্যে তার এমন সহুরে বন্ধু জুটিয়াছে সহরে আসিয়াই!

প্রথম প্রথম জ্যোতির মুখে বড় বড় লোকের বাড়ী চাকরী করা আর একধার হইতে বাড়ীর মেয়ে বৌদের সঙ্গে পীরিত করার অশ্লীল গল্প শুনিতে শুনিতে শ্রীপতির মনে হইত, কলির কোন দেবতা কি পৃথিবীতে জন্ম নিয়া সৌখীন বাড়ীর সৌখীন চাকরের বেশে লীলা খেলা করিতেছেন!

শুধু পাঁচীর ঘরে গিয়া মাতলামির লীলাখেলা করার ঝোঁকটার জন্য সে তাকে চাকররূপী দেবতা বলিয়া মানিতে পারে নাই।

এখন সে টের পাইয়া গিয়াছে যে জ্যোতির দৌড় বস্তির ওই সস্তা পাঁচী পর্য্যন্তই। বয়স কম, চেহারায় জলুষ আছে, চাকরের কাজে ঢুকিয়া দু'একটা বাড়ীতে দু'একটা কেলেঙ্কারী হয় তো করিয়া থাকিতে পারে—একধার হইতে ভদ্রঘরের বালিকা তরুণী বয়স্কা নারীর হৃদয়রাজ্য জয় করিবার উদ্ভট উৎকট কাহিনী-গুলি সবই তার বানানো।

নিজের মনের বিকারকে খাতির করিবার জন্য বানানো। তার মত গেঁয়ো সরল মানুষকে শ্রোতা হিসাবে না পাইলে তাই তার মিথ্যা গল্প বলার রস জমে না।

হাতে পয়সা থাকিলে সে পাঁচীদের ঘরে গিয়া মাতলামি আর হল্লার লীলাখেলা করে, পয়সা না থাকিলে মন-মরা হইয়া তাকে উৎকট বীভৎস রসে রসাইয়া রসাইয়া গল্প বলিয়া নিজের বিকারকে সামলানোর চেষ্টা করে।

শুনিতে শুনিতে বিচলিত অভিভূত হইয়া যাইত ভাবিলে এখন শ্রীপতির নিজের গ্রাম্যতায় অজ্ঞতায় লজ্জা বোধ হয়, হাসি পায়।

একটা গেঁয়ো বৌ কদমের তাল সামলাইতে তার প্রাণান্ত হয়, দুর্গাকে পর্য্যন্ত ছাটিয়া ফেলিতে হয়—মোহনের পেয়ারের চাকর বলিয়া এবং চেহারায় একটু জলুষ আছে বলিয়া জ্যোতির বেলা যেন প্রেম করিতে গেলে দায় ঘাড়ে করার নিয়মটা বাতিল হইয়া যাইবে।

কদম পর্য্যন্ত তাকে এতটুকু রেহাই দেয় না, সহরের চালাক চতুর মেয়েরা যেন কদমের চেয়ে বোকা!

গ্রামে থাকিতে শ্রীপতি বিশ্বাস করিত, দাম দিয়া পীরিত হয় না। এখন সে জানিয়া গিয়াছে পীরিত করার দামও পুরুষকে দিতে হয়!

জানিয়া কত দিক দিয়া যে সে স্বস্তি বোধ করিয়াছে!

ভূপালও তাকে নানারকম গল্প শোনায়—শ্রমিকের লড়াই হইতে সহরের জীবন ও ঘটনা হইতে কেচ্ছা পর্য্যন্ত অনেক বিচিত্র কাহিনী। তার কেচ্ছা জ্যোতির নিজের বাহাদুরীর বানানো কাহিনীর চেয়ে কম অশ্লীল হয় না—

কারণ, শুনিলেই বুঝা যায় অন্যের ব্যাপার হইলেও ভূপাল বানাইয়া বলিতেছে না, হয় তো খানিকটা রং চড়াইয়াছে।

যখন বলে একেবারে চুটাইয়া বলে, তবে জ্যোতির মত তার এই একটিমাত্র রসই সম্বল নয়।

প্যাঁচ কষে না, কায়দা করে না, সোজা স্পষ্ট কাটাকাটা কথা বলে, তবু জীবনের কত রকমারি দিক, আশ্চর্য্য দিক রূপ নেয় ভূপালের কথায়। মনে হয়, প্রতিদিন তার যে নতুন অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে একেবারে অজানা বিষয়ে ভূপালের বর্ণনার সঙ্গেও যেন তার কেমন একটা মিল আছে।

মজুরের লড়াই-এর কথা শুনিতে শ্রীপতির খুব আগ্রহ জাগে। কিসের লড়াই আর কেন লড়াই তার আসল কথাটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া গিয়াছে। এসব তারও লড়াই, তার স্বার্থের সঙ্গেও এসব জড়িত।

মজুরি বাড়ানোর লড়াইটাই ধর। মজুরি বাড়িলে সে কদমদের আনিতে পারে। কাজ শিখিলে তার মজুরি বাড়িয়া কাজ পাকা হওয়ার কথা।

নিজের ছোট গেঁয়ো কামারশালায় হাতুড়ি পিটিয়া তার জীবন কাটিয়াছে, কি এমন কঠিন কাজটা তাকে এখানে করিতে দেওয়া হইয়াছে যে এতদিনেও ভাল করিয়া কাজ শিখিতে বাকী থাকিবে?

কিন্তু কেউ একথা কানেও তোলে না যে সে ভাল কাজ শিখিয়াছে, এবার তার পাকা কাজের মজুরি পাওয়া উচিত!

ভূপাল এক গাল হাসিয়া বলে, 'যা যা বড়াই করিস নে! এর মধ্যে কাজ শিখে গেছেন, পাকা কাজ চাই, বেশী হপ্তা চাই। তোর শালা ঢের দিন বাকী কাজ শিখতে।'

'কাজ শিখিনি? ঠিকমত কাজ করছি না?'

'শিখেছিস তো শিখেছিস! ঠিকমত কাজ করছিস তো করছিস! তাতে কি হয়েছে রে ব্যাটা? সময় হবে, মর্জি হবে, তবে কাজ পাকবে।'

স্বর পাল্টাইয়া মুখ বাঁকাইয়া একজন মধ্যস্থ কর্তাব্যক্তির হাবভাব নকল করিয়া

ভূপাল বলে, 'তেড়ি-বেড়ি করিস নে বাবা, তেড়ি-বেড়ি করিস নে—দোহাই তোর! তবু তো খেটে খাচ্ছিস? খেদিয়ে দিতে জবরদস্তি করিস নে বাবা, করিস নে—দোহাই তোর। আখেরে ভাল চাস্ তো চুপচাপ খেটে যা। গা থেকে পাঁকের গন্ধ যায় নি, কাজ শিখে গেছিস্!'

শ্রীপতি হাসিয়া ফেলে।

কাজ পাকা করার কথা বলিতে গেলে ঠিক এইভাবে এইরকম ভঙ্গি করিয়া এই কথাগুলিই শঙ্করবাবু তাকে বলিয়াছিল বটে।

তেমন বনিবনা না থাকিলেও জ্যোতির সঙ্গে বিবাদ বা বিচ্ছেদ হয় নাই। জ্যোতির অশ্লীল গল্প আজও কিছু কিছু শুনিতে হয়। তবে শুনিতে শুনিতে সে অভিভূত হইয়া পড়ে না বলিয়া, মাঝে মাঝে খাপছাড়া প্রশ্ন করে এবং খাপছাড়া ভাবে হাসিয়া ওঠে বলিয়া, তাকে গল্প শুনাইবার উৎসাহ জ্যোতির ঝিমাইয়া আসিয়াছে।

আগে জ্যোতি ছিল বক্তা, শ্রীপতি ছিল নীরব শ্রোতা। আজকাল শ্রীপতি কখনো কখনো তার অভাব অভিযোগ রাগ দুঃখ আপসোসের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে—একটি কলেজে পড়া মেয়ের সঙ্গে জ্যোতির পিরীত জমিয়া নোংরামির ক্লাইমেক্সে উঠিবার মুখে শ্রীপতির আপবোস ফাটিয়া পড়িলে—কয়েক মিনিট তাকে চুপচাপ শ্রীপতির কথা শুনিয়া যাইতে হয়!

খানিকটা অভিভূত ও বিচলিত হইয়াই শোনে।

মনটা যে তার ধাক্কা খাইয়াছে, নড়িয়া উঠিয়াছে, খানিকক্ষণ শ্রীপতির কথা শুনিবার পর তার অস্থিরতা সুরু হইলেই সেটা বোঝা যায়।

কত যে আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বলে, 'তুই বড় বোকা ভাই। তোর কোনদিন কিছু হবে না। সংসারের চালচলন কিছুই বুঝিস নে তুই।'

'কি বুঝিনে?'

'কিছুই বুঝিস্ নে। কাজ কি তুই বাগিয়েছিস? নিজের চেষ্টায়? কাজ যারা বাগিয়ে দিয়েছে তাদের কাছে যা না বোকারাম হাঁদারাম! কাজ যারা জুটিয়ে দিল, কাজটা তারা পাকা করে দিতে পারবে না?'

কথাটা যে শ্রীপতি ভাবে নাই তা নয়। কিন্তু মোহনকে কাজের বিষয় কিছু বলিতে সে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করে।

তার লজ্জা হয়।

মোহন জগদানন্দকে বলিয়া তাকে যে কারখানায় ভর্ত্তি হইবার সুযোগ দিয়াছে, কাজ করিয়া কাজ শিখিবার সামান্য মজুরি পাইয়াও সে যে মোহনের বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কদমকে নিয়মিত দু'চারটাকা পাঠাইতে পারিতেছে—এই তো যথেষ্ট করিয়াছে মোহন।

সাহায্য করিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীপতি ভুলিতে পারে না যে মোহন তাকে অনুগ্রহ করে নাই, কাজটা তাকে ভিক্ষা হিসাবে জুটাইয়া দেয় নাই।

যতই দুঃস্থ হোক, নীচু জাতের লোক হোক, মোহনের সে গ্রামবাসী। উঁচু জাতের ওই পীতাম্বরের মতই সে-ও তার প্রজা নয়, তার এক কাঠা জমির ধারও সে কোনদিন ধারে নাই।

শ্রীপতির স্পষ্ট মনে আছে, তার প্রায় সমবয়সী পনের ষোল বছরের মোহন একদিন লুকাইয়া তাদের বাড়ী আসিয়াছিল, বহুকালের পুরানো একটা তলোয়ারে ধার করিয়া দিবার জন্য তার বাবাকে অনুরোধ জানাইয়াছিল।

যেটুকু ধার ছিল তলোয়ারটায় সেটা আরও খানিকটা ভোঁতা করিয়া দিয়া তলোয়ারটা শুধু ঝকঝকে করিয়া দিয়াছিল তার বুড়ো বাবা।

মোহন খুসী হইয়া পুরো একটা টাকা মজুরি দিতে চাহিলে তার বুড়ো বাবা ফোকলা মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল, 'তোমার খেলনা বানিয়ে দিয়ে পয়সা নেব কি গো! মোটেই পারি নাকো নিতে!'

গ্রামবাসী শত শত প্রজা আছে, খাতক আছে মোহনের। তারা একজন কেউ আবদার করিলে মোহন কি তাকে সাথে নিয়া কলিকাতা আসিতে রাজী হইত!

তারা দু'জন গরীব কিন্তু প্রজা নয়, গ্রামবাসী।

মোহন যথেষ্ট করিয়াছে, গরীব গ্রামবাসী হিসাবে আবার তাকে মজুরি

বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলে অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইবে, ভিক্ষা চাওয়া হইবে।

মোহন যদি বিরক্ত হয়, যদি বলে যে একটু প্রশ্রয় দিলেই শ্রীপতিরা মাথায় উঠিতে চায়, বড়ই সেটা অপমানের কথা হইবে শ্রীপতির!

আগে ছিল না, মান অপমানের এই জ্ঞান শ্রীপতি সহরে আসিয়া অর্জ্জন করিয়াছে, কারখানায় অর্জ্জন করিয়াছে।

কয়েকমাস আগে হইলে অনায়াসে সময়মত সুযোগমত ভিখারীর মতই মোহনকে সে তার প্রার্থনা জানাইতে পারিত।

কিন্তু ভালভাবে কাজ শেখা হইয়াছে, পাকা কাজ ও বেশী মজুরির দাবী জন্মিয়াছে—এই দৃঢ় বিশ্বাসটা তখনও জন্মে নাই। সুতরাং দাবীটা আদায় করিয়া দিবার জন্য মোহনের কাছে আবেদন জানাইবার প্রশ্নও ওঠে নাই।

ন্যায্য দাবীর বোধটা জন্মিতে জন্মিতে জন্মিয়া গিয়াছে মান অপমানের নূতন বোধটাও!

মোহনের বাড়ীতে চাকরদের ঘরে হইলেও বিনা ভাড়ায় পাকা ঘরে থাকিবার এবং আশ্রিত ও চাকর বাকরের জন্য ভিন্ন রান্না করা অন্ন হইলেও দু'বেলা পেট ভরাইবার অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে শ্রীপতির নবজাগ্রত আত্মসম্মান বোধে বাধে না কেন?

আশ্রয় আর অন্ন দেওয়ার বদলে মোহন এবং মোহনের সংসার তাকে চাকরের মতই খাটাইয়া নেয় বলিয়াই বাধে না!

জ্যোতি সৌখীন চাকর—মোহনের সৌখীন জীবন যাপনের প্রয়োজনেই শুধু তাকে রাখা।

বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নামে একটা ঠিকা ঝি রাখিলেও তার সাধ্য কি এতবড় সংসারের বৃহত্তম অংশটার কাজ চালায়?

আশ্রিতা কিন্তু নিকট আত্মীয়াদের মধ্যে তিনজনকে মোহন দেশের বাড়ীতে ফেলিয়া আসিতে পারে নাই—মার জন্য সঙ্গে আনিতে হইয়াছে। বলিতে

গেলে তাদের মধ্যে অনাদৃতা দু'জন ঠিকা ঝিয়ের সঙ্গে সংসারের ওইসব কাজ সারে।

অন্যজন মার পেয়ারের লোক। তার কাজ শুধু মার মন যোগাইয়া চলা।

কতগুলি কাজ আছে যে কাজ করিবার লোক নাই। শ্রীপতি করিয়া না দিলে মোহনকে আরেকজন সাধারণ চাকর রাখিতে হইত।

জ্যোতি বাজারে যায়, মুদি মনোহারী দোকানেও যায়। কিন্তু সে বাজার করে সওদা আনে শুধু মোহনদের এবং তার বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগতদের জন্য—যাদের জন্য রান্না-বান্না হয় ভিন্ন, টেবিলে যারা ডিসে প্লেটে খায়।

মার নেতৃত্বে সংসারের অন্য অংশের—আমিষ নিরামিষ রান্নার বাজার এবং অন্যান্য কেনাকাটা শ্রীপতি করিয়া দেয়।

সে-ই প্রতিদিন গাড়ীটা ধোয়া মোছা সাফসুফ করে বলিয়াই মোহনকে একজন ক্লিনার রাখিতে হয় নাই।

অনেক বাড়ীর অনেক গাড়ীর ড্রাইভার নিজেই এসব কাজ করে—কিন্তু মোহনকে বেশী বেতনের বাবু ড্রাইভার রাখিতে হইয়াছে। এ গাড়ীতে অন্য ড্রাইভার মানায় না।

বাবু ড্রাইভার ইঞ্জিনটা সাফ করে। ধুলা কাদা সাফ করা তার কাজ নয়।

মা'র এবং তার পেয়ারের আশ্রিতা বিধবাটির অনেক ফাইফরমাসও শ্রীপতির উপর দিয়া চলে।

কাল একাদশী গিয়াছে।

আজ সকালে মা'র ফরমাসে সে গোপনে পাঁচ রকম সহুরে মিষ্টি সহরের নাম করা দোকান হইতে আনিয়া দিয়াছে।

'কাকপক্ষী যেন টের না পায় ছিপতি।'

কাকপক্ষী টের পায় নাই।

কে জানে মোহন জানে কিনা যে সে-ও তার একজন বিনা মাইনের চাকরের সামিল হইয়াই চাকরের জন্য বরাদ্দ আশ্রয় ও অন্ন ভোগ করিতেছে।

জানা অবশ্য উচিত। অন্য কাজ করে কি করে না সেটা অজানা থাক—প্রায় প্রতিদিন ভোরে সে তো তাকে গাড়ীটা সাফ করিতে দেখিয়া আসিতেছে। তার বাবু ড্রাইভার নাক ডাকিয়া ঘুমায়। চিরদিনের অভ্যাসের বশে ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া মোহন নতুন গাড়ীর টানে গ্যারেজের দিকে আসে—দেখিতে পায় তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় দামী গাড়ীটা শ্রীপতি কত যত্নে সাফ করিতেছে!

শুধু ছ্যাথে না।

গাড়ীটার ঝকঝকে তকতকে নতুনত্ব বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে তাকে এখানটা ভাল করিয়া ঝাড়িতে, ওখানটা ভাল করিয়া মুছিতে বলে।

অর্থাৎ হুকুম দেয়।

বলে, 'মাড গার্ডের ওখানে একটু ময়লা জমেছে শ্রীপতি।'

'ময়লা নয়। চলটা উঠে মর্চে ধরেছে।'

কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য যায়গাটা সে বার বার ঘষিয়া পুঁছিয়া দেখায়।

হাজার ঘষিয়াও চাঁদের কলঙ্কের মত মাড গার্ডের কলঙ্ক ওঠে না।

মোহন আপসোস করিয়া বলে, 'এর মধ্যে চলটা উঠে গেল? কি করে গেল?'

অন্য কোন কথাই মোহন তার সঙ্গে বলে না। শ্রীপতি গামছা পরিয়া তার গাড়ীটা সাফ করিতেছে দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করে না, 'তোমার কাপড় নেই শ্রীপতি? পায়জামা প্যাণ্ট নেই?'

পীতাম্বরকে তাড়াইবার আগের দিনের ভোরে শুধু একটি নিয়ম-ছাড়া প্রশ্ন সে তাকে করিয়াছিল—'পীতাম্বর ঠাকুর সাধক পুরুষ না-রে শ্রীপতি? তুই তো ওকে জানিস অনেক কাল। উনি যোগ সাধনা ক্রিয়া কর্ম্ম খাটাতে পারেন?'

প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই ক্ষোভ জাগিয়াছিল শ্রীপতির। তার মত লোককে মোহনের এরকম প্রশ্ন করা কি উচিত?

চার হাত লনের ফুল লতা পাতার বহরের এদিকে ঠেলিয়া দেওয়া চাকর বাকরের

গ্যারেজ সন্নিহিত টালির ঘরে একসাথে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়াই তো সে ঘনিষ্ঠভাবে পীতাম্বরের বাঁচার কায়দা জানিয়াছে ?

তাকে কি উচিত জিজ্ঞাসা করা পীতাম্বরের বিষয়ে কোন কথা ?

কোন জবাব না দিয়াই সে বালতি নিয়া জল আনিতে গিয়াছিল।

কে জানে কোথায় গিয়াছিল মোহন অথবা নগেন, গাড়ীটাতে কাদা মাখাইয়া আনিয়াছে। কাদা সাফ করিতে তাকে কমপক্ষে সাত আট বালতি জল টানিতে হইবে।

জবাব না পাওয়ায় মোহনের হইয়াছিল রাগ। ধমক দিয়া সে বলিয়াছিল, 'একটা কথা জিগ্যেস করলাম, জবাব দিলি না যে ?'

'কি জবাব দেব বলুন ? পীতম ঠাকুরকে আপনে এনেছেন বামুন সাধক বলে। আমি কলে কুলি খাটি, আপনার ঘরে চাকর খাটি—'

'চাকর খাটো মানে ?'

'বাজার করি, মসলা বাটি, আপনার গাড়ী সাফ করি—'

কী চালাক হইয়া উঠিয়াছে শ্রীপতি ! এমনি লাগসই ভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল মোহনের।

'কে তোমায় বাজার করতে, মসলা বাটতে বলে ?'

'আপনার মা বলেন।'

'মার কাছে মাইনে চাও না কেন ? মা তোমাকে চাকর খাটায়, মার কাছে মাইনে আদায় না করে আমার কাছে নালিশ কর কেন ?'

'মাথা গুঁজে আছি, দু'বেলা খাচ্ছি—'

'সে তো আমার ব্যবস্থা শ্রীপতি। মার চাকর খাটতে আমি তো বলি নি তোমায় !'

শ্রীপতি দমিয়া যায়। মোহন তাকেও কাজে লাগাইতে চায় তার ঘরোয়া যুদ্ধে। মার কোন ভাগ নাই, নগেন কিন্তু বাপের টাকা আর সম্পত্তির সমান অংশীদার।

নগেনকে বাগাইয়া মা যুদ্ধ সুরু করিয়াছেন মোহনের বিরুদ্ধে। মোহন চায় যে শুধু তার গাড়ীটাই সাফ করিবে—মার কোন হুকুম মানিবে না।

অথচ তার দু'বেলা পেট ভরার ব্যবস্থা যে মা'র হাতে এটা মোহন জানিয়া শুনিয়া মানিয়া নিয়েছে।

মার হুকুম না শুনিলে তাকে যে না খাইয়া খালি পেটে কারখানায় খাটিতে যাইতে হইবে এই সোজা কথাটাও কি খেয়াল নাই মোহনের?

আট

সন্ধ্যা সেদিন সকালে পায়ে হাঁটিয়া আসে এবং বিস্মিত মোহনকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ না দিয়াই একেবারে ব্যাখ্যাটা শুনাইয়া দিয়া মোহনকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

'তোমার বন্ধুর বাড়ীতেই স্বামীসোহাগিনী হয়ে রাত কাটিয়েছি মোহন। অমন করে তাকিও না মোহন। আমি যেচে আসি নি, বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে।'

ঝরণার সেই হুমকি মোহনের মনে ছিল। যে ভাবে পারে সন্ধ্যাকে সে জব্দ করিবে বলিয়াছিল, দরকার হইলে বন্ধুকে দিয়া দাদাকে নষ্ট করাইয়া সন্ধ্যাকে জব্দ করিবে।

'ঝরণা?'

'দূর! আমায় আসতে বাধ্য করবে ঝরণা? অত মুরোদ থাকলে সোকা সোকা ছেলেমানুষদের বাগাতে যেত না।'

ঝরণা আর নগেনের নিদারুণ সমস্যাটা সে যেন খেলার ছলেই উল্লেখ করে, তার কাছে যেন একেবারে তুচ্ছ কথা বয়সে ছ'সাত বছর বড় ঝরণার নগেনকে বাগানোর প্রচেষ্টা!

মোহন মুখ খুলিতে যাইতেই সন্ধ্যা অপরূপ ভঙ্গিতে আঙুল উঁচাইয়া তাকে থামাইয়া দেয়।

বলে, 'ওদের কথা পরে বলব মোহন, আগে আমার কথা শোন।'

বলিয়া সে হাসে, 'শুধু নিজের কথা বলতে এসেছি ভেবো না। নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে তোমাকে এক বিষয়ে সাবধান করে দিতেও এসেছি।'

নিজের কথাটাই সন্ধ্যা আগে বলে, ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে সে কেন চিন্ময়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

'এতদিনে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে তোমার বন্ধুর। পাগলের মত ভালবেসেই যে বৌকে বশে রাখা যায় না এটা বুঝে গেছে।'

টেলিফোন করিয়া সন্ধ্যা টাকা চাহিলেই চিন্ময় লোক মারফতে টাকা পাঠাইয়া দিত। কিছুদিন হইতে সে টাকা পাঠাইতে টালবাহনা সুরু করিয়াছিল—টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার জন্য, সন্ধ্যার দাবীর চেয়ে কম টাকা পাঠানোর জন্য, খুব আপসোসের সঙ্গে নানারকম জটিল আর এলোমেলো কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করিয়াছিল!

'এমন করে কথা বলত চিঠি লিখত যেন সময়মত আমার দরকারের সব টাকাটা পাঠাতে না পেরে নিজের হাত পা কামড়ে মরে যেতে চাইছে। আমি যেন রাগ না করি সেজন্য সে কি করুণ মিনতি—চিঠি পড়লে বন্ধুর জন্য তোমার চোখে জল আসত মোহন। আমিও প্রথমটা বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম, সত্যিই বুঝি মুস্কিলে পড়েছে। তারপর বাড়াবাড়ি দেখে টের পেলাম যে এটা নতুন চাল। একেবারে মরিয়া হয়ে টাকা দেওয়া বন্ধ করে আমাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে।'

'ভুল চাল দেয় নি দেখাই যাচ্ছে।'

এটা বিষম খোচা। সন্ধ্যা কোনদিন খোঁচা দেওয়া ঠেস দেওয়া কথা সহিতে পারিত না। আজ সে অনায়াসে হাসে।

'তুমি ছাড়া আমার বন্ধু নেই—তাই মনের ভেতরের কথাটা তোমায় খুলে

বলছি। মেয়েমানুষ মনের কথা কারো কাছে ফাঁস করে না—মুস্কিল হয়, বিপদ ঘাড়ে বলেই ফাঁস করে না। আমাদের বাঁচার যে কত কষ্ট কত বিড়ম্বনা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। তুমি বন্ধু বলেই তোমায় খুলে বলছি।'

মোহন চুপ করিয়া থাকে। লাবণ্যের মুখেও এই রকম কথা সে শত শতবার শুনিয়াছে যে তার যন্ত্রণা পুরুষ মানুষ সে কি বুঝিবে!

সন্ধ্যা সোফায় এলানো গা তুলিয়া সোজা হইয়া বসে, তার একমাত্র পুরুষ বন্ধুর দিকে আগুনের ঝলক-মারা চোখে চাহিয়া বলে, 'তোমরা পুরুষরা আমাদের কি মনে কর বল ত? তোমরা ব্যবস্থা করবে, আমরা তাই মেনে নেব? তোমাদের আইন কানুন উল্টে দেবার জন্য আমরা তাই কোমর বেঁধে লড়ছি।'

'লড়ছ?'

'লড়ছি।'

'যারা আইন বানায় তাদের সঙ্গে সোজাসুজি নয়, তোমাদের সঙ্গে সোজাসুজি লড়ছি। সব কিছু পাল্টে না দিলে আমাদের আর হাসিমুখে পাশে পাবে না।'

'টাকা বন্ধ করেই পাশে টেনে এনেছে, এ কেমন লড়াই তোমার?'

'পাশে আগে ছিলাম—বনিবনা হল না, সরিয়ে দিল। চাপ দিয়ে আবার পাশে টেনে এনেছে। হাসি মুখে এসেছি ভেবেছ নাকি? গায়ের জোর,—মানে টাকার জোরে পায়ে টানার মজাটা বন্ধু তোমার টের পাবে!'

আবার গা এলাইয়া দিয়া সে সহজ স্বরে বলে, 'যাক্ সে। ওসব কথা নিয়ে থিয়োরির তর্ক জুড়তে আসি নি। হিসাবনিকাশটা খুলেই বলি তোমাকে।'

সে একটু থামে

'বুঝলাম, একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হয় তো একদিন টাকা আর রিভলবার নিয়ে যাবে, টাকাটা হাতে দিয়ে আমায় গুলি করে নিজের মাথায় গুলি করবে। তাই বাধ্য হয়ে সামলাতে আসতে হল।'

'সামলে কি করবে?'

'জানি না। ঠিক করিনি।'

পোষাকে জ্বালানো সন্ধ্যা যেন সাপিনীর মত ফণা তুলিয়া সামনে ঝুঁকিয়া ফুঁসিয়া বলে, 'সামলাবার দায় আমার কেন বল তো? টাকায় কেনা বৌ বলে? সামলাতে দু'চার মাস লাগবে। ছেলে হোক মেয়ে হোক একটা ঘুষ দিতেই হবে এবার—নইলে সামলানো যাবে না। টাকায় জব্দ করে আমাদের মা করো, ধিক্ তোমরা পুরুষমানুষ!'

মোহন ভাবে, পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যার নীতি কি আজও চালু আছে—চিন্ময় সন্ধ্যাদের সামাজিক স্তরেও?

নগেন আর ঝরণার ব্যাপারে সন্ধ্যার মন্তব্য শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

নগেনের সমস্যা তাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যা এক রকম যাওয়ার মুখে নগেন ও ঝরণার প্রসঙ্গ তোলে।

'এ ব্যাপারে একদম চুপচাপ থাকবে মোহন, কিছুই করবে না। কিছুই বলবে না। তুমি হস্তক্ষেপ করতে গেলেই তুমি ঝরণাকে জিতিয়ে দেবে, তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'বুঝিয়ে বলো।'

'সোজা কথাটা বুঝতে পার না? সব কিছুতে নগেনেরও সমান ভাগ। ঝরণা ওকে খেলাচ্ছে ভোলাচ্ছে ওই ভাগটার লোভে। নগেনকে টের পেতে দেয় না—সম্পত্তির ভাগটাই আসল-নগেন আসল নয় টের পেতে দিলে কি রক্ষা থাকবে? একেবারে বিগড়ে গিয়ে হাতছাড়া হয়ে যাবে নগেন।'

'কিছুই করব না?'

'কিছুই করবে না। শুধু স্নেহ দেখাবে, বিবেচনা দেখাবে। রোগা হয়ে যাচ্ছে বলে মাছ দুধ মাংস খাওয়াবে, বেড়ানো দরকার বলে কাশ্মীর বেড়াতে পাঠাবে—'

মোহনের মুখ দেখিয়া সন্ধ্যা গলা নামাইয়া বলে, 'একালের ছেলে তো?

অনেক কিছু জানে বোঝে। কর্ত্তালি করতে গিয়ে ওর রোখ চাপিয়ে দিও না, বিচার বুদ্ধি চুলোয় দেবার ঝোঁক চাপিও না। ঝরণার খেলা নিজে বুঝে নিজেকে ও সামলে নেবে। এ সুযোগটা ওকে তোমায় দিতেই হবে।'

মোহন আচমকা জিজ্ঞাসা করে, 'কদিন এখানে থাকবে?'

সন্ধ্যার মুখে রাত্রির কালো ছায়া নামিয়া আসে।

'কে জানে। কদ্দিনে পেটে ছেলে আসবে বলা যায় কি? তারপর দশমাস দশদিন। ছেলেটাকে পাঁচ ছ'মাসের না করে নড়তে পারব কি?'

সন্ধ্যা যেন ধরিয়া লইয়াছে তার ছেলেই হইবে—যহেতু চিন্ময় ছেলে চায় মেয়ে যেন তার হতে পারে না!

আজকাল নূতন পরিবেশে যখন সামাজিক, পারিবারিক, দৈহিক ও মানসিক জীবন অনেকটা নির্দ্দিষ্ট রূপ পাইয়াছে, মোহন মাঝে মাঝে সহরে বাস করিতে আসার উদ্দেশ্যের কথা ভাবিতে চেষ্টা করে।

গ্রাম ছাড়িয়া কেন সে সহরে বাস করিতে আসিয়াছিল?

সভ্যতার সুখসুবিধা ভোগ করিতে আর সেই সুখসুবিধা যারা পুরামাত্রায় ভোগ করে তাদের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে এবং অর্থোপার্জ্জন করিতে?

কারণটা এখন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন মনে হয়। গ্রামে বসিয়া দিনের পর দিন সে কি কল্পনা করিয়াছিল মেটে পথে হাঁটার বদলে পিচঢালা পথে মোটর হাঁকানো আর গরীব অশিক্ষিত মানুষের বদলে ধনী সুশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার? এ তো পুণ্য বা শান্তি লাভের চিন্তা বাদ দিয়া তীর্থবাসের ভুয়া কল্পনার মত।

সহরের বাড়ী, গাড়ী, সঙ্গী, সাথী, সুখ, সুবিধা আনন্দ, উৎসবের জন্য সে লুব্ধ ছিল, এসব নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তন কল্পনাও করিত সর্ব্বদা,—অন্য কিছুর আশায়। এসব

ছিল আনুষঙ্গিক, আসল কল্পনা নয়। কি যেন গড়িয়া তোলার আয়োজনের মত সহরের জীবনকে সে কল্পনা করিত।

সে কথা আজ কিছুতেই মনে করিতে পারে না! ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠে, উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ মনে হয় জীবন, অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মতও সে স্মরণ করিতে পারে না কি চাহিয়া সহরে বাস করিতে আসিয়াছিল। অথচ এটুকু বেশ ভালভাবেই মনে পড়ে যে তখন সেই উদ্দেশ্যই মিশিয়া থাকিত তার সমস্ত ভাবনা চিন্তায়, তার প্রেরণা সে অনুভব করিত স্পষ্ট।

আজ কেন খোঁজ পায় না?

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া? স্বাদের মত শুধু কল্পনা আর অনুভূতিতে মিশিয়া থাকিত বলিয়া? বাস্তব রূপ দিবার চেষ্টা আরম্ভ করা মাত্র বাস্তবতার সংস্পর্শে সে স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে?

মোহনের অসন্তোষ দিন দিন বাড়িতে থাকে।

যেমন ভাবিয়াছিল, সহরের জীবনটা সে রকম হয় নাই। তার ঈর্ষাতুর কামনাকে সার্থক করিয়া সহরের বিশেষ সম্প্রদায়টির মানুষগুলি তাকে নিজেদের একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে রকম মজা লাগে কই? ব্যাপক সামাজিক জীবনকে আয়ত্ত করিয়া সজাগ সক্রিয় জীবনযাপনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা কোথায়?

তা ছাড়া শুধু বন্ধু পাওয়ার হিসাবটাই সে ধরিয়াছিল, এত শত্রু তার জুটিল কোথা হইতে, তুচ্ছ কারণে আর সম্পূর্ণ অকারণে তার উপর যাদের বিরাগ জন্মিয়াছে?

মাকেও আজকাল মাঝে মাঝে মোহনের শত্রু মনে হয়। ভাইবোনদের আড়াল করিয়া মা তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন, কাছে ঘেঁষিবার উপায় নাই। ওদের মনের মত গড়িয়া তুলিবার কল্পনাটা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

মা থাকিতে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে ওদের জন্য কিছু করা একেবারেই অসম্ভব।

তাকে বাদ দিয়া ওরা শুধু পরামর্শ করে না, আজকাল তার কাছে ঘেঁষিতে চায় না, কাছে ডাকিলে অস্বস্তি বোধ করে। দূর হইতে নীরবে ওরা তার দিকে তাকাইতে শিখিয়াছে। ওদের চোখে ভীত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই সে আবিষ্কার করে, খোকাখুকীর চোখে পর্য্যন্ত।

নগেনের সঙ্গে মার অফুরন্ত আলোচনা ওদের কানেও যায়। মোহন কতদিন দেখিয়াছে খেলার সময় খেলা ফেলিয়া খোকাখুকী মা'র গা ঘেঁষিয়া দু'চোখ বড় বড় করিয়া মা আর ছোড়দার কথা শুনিতেছে।

বুঝিতে না পারুক, শুনিতে শুনিতে ধারণা গড়িয়া ওঠে। দাদাকে কেন্দ্র করিয়া এক ঘনায়মান দুর্ব্বোধ্য বিপদের ভয় খোকাখুকীর মনে সঞ্চিত হইতে থাকে।

নলিনী দাদাকে খুব ভালবাসিত।

তার সঙ্গেই মোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। নগেন ছিল ভাই, খোকাখুকী ছিল ছোট, নলিনী তাই সব টুকিটাকি কাজ করিত মোহনের, এটা আনা, ওটা ধরা, সেটা খোঁজা, এর কাছে ওর কাছে তার নির্দ্দেশ বহন করা। সেও ভয় করিতে শিখিয়াছে, তবে ভয়টা বোধ হয় তার অবুঝ নয়, তের বছরের মেয়ে অনেক কিছু বুঝিতে শেখে। তাই, দু'চার দিন বাহিরের জীবনের ব্যস্ততায় মোহন তাকে ভুলিয়া থাকিলে সেও বিগড়াইয়া যায় বটে, অল্প চেষ্টাতেই বোনের মনকে মোহন আবার হাল্কা করিয়া দিতে পারে।

এখনো পারে!

প্রথমটা নলিনী একটু আড়ষ্ট হইয়া থাকে। নূতন করিয়া যেন বিচার করে যে দাদা তার কেমন মানুষ, যেন ভাবিয়া পায় না দাদার সঙ্গে আবার ভাব করা উচিত কিনা।

'তোর চুলটা হঠাৎ এত লম্বা হল কি করে রে!'

'কই?'

'এই যে বিনুনীটি এক হাত দেড়হাত বেড়ে গেছে?'

'এক হাত দেড় হাত কখনো বাড়ে? চার পাঁচ আঙ্গুল।'

'রোজ তোর চুল চার পাঁচ আঙ্গুল বাড়ে নাকি ?'

তখন হাসি মুখে নলিনী বিনুনীর ডগাটা দাদার সামনে মেলিয়ে ধরে, বিনুনী লম্বা করার কৃত্রিম উপায়টা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। সে তখন একেবারে ভুলিয়া যায় দাদার বিরুদ্ধে শোনা রাশি রাশি অভিযোগ, মোহন ভুলিয়া যায় বোনের মন ভুলানোর জন্য অভিনয় আরম্ভ করার কষ্ট আর অপমান!

'ওরে পাজী মেয়ে, এইসব ফাঁকি শিখেছ ?'

'আমি একা নাকি ? সবাই করে।'

নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেই নগেনের সঙ্গে মার পরামর্শের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছাও হয় মোহনের। নগেনের সঙ্গে মা কি এত পরামর্শ করেন সে বিষয়ে তার তো শুধু অপমান, তার কাছে মার স্পষ্ট অভিযোগ আর ভাইবোনের রকমসকম দেখিয়া আন্দাজ করা।

হয় তো সবই সে ভুল আন্দাজ করিতেছে—আগাগোড়া ভুল বুঝিতেছে। হঠাৎ সহরে আসিয়া সহুরে হইবার তার অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারিয়া পিছাইয়া থাকিবার ক্ষোভ দুঃখ অভিমানে ব্যাকুল হইয়া নিজেদের মধ্যে অবিরাম পরামর্শ চালাইতেছে, কি করিয়া তার নাগাল ধরা যায়। ওরা তার কাছে আসিতেই চায়, সে-ই হয়তো ওদের পিছনে ঠেলিয়া রাখিতেছে।

মনে মনে সে অনেকরকম প্রশ্ন তৈরী করে, নলিনী সে প্রশ্নের আসল মর্ম বুঝিবে না. জবাব শুনিয়া সে কিন্তু সব বুঝিতে পারিবে।

অনেক ভাবিয়া, অনেক বাছিয়া প্রশ্ন যদি-বা সে ঠিক করে, নলিনীর মুখ দেখিয়া সে প্রশ্ন আর উচ্চারণ করিতে সাহস পায় না।

নলিনী কচি মেয়ে নয়, অবুঝ নয়, সরল নয়, তার কল্পনার সংসারে সাংসারিক ঘোরপ্যাঁচের এতটুকু ছোঁয়াচ না লাগিয়া হাসিয়া খেলিয়া সে বড় হয় নাই। তার কাছে পাকামি ভুলিয়া শিশু হইয়া যায়, সেটা শুধু অভ্যাস। যত কৌশলেই সে প্রশ্ন করুক ওর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

মা তার এক ছেলের সঙ্গে কি বলাবলি করে, মার আরেক ছেলেকে গোপনে সে খবর দেওয়ার মধ্যে হইবে নতুন এক পাকামিতে হাতেখড়ি, বাকী জীবনটা একের গোপন কথা বলিয়া বেড়াইবে অন্যকে।

কী তার আসিয়া যাইবে তাতে ?

এতই কি সে স্নেহ করে বোনকে যে ভবিষ্যতে সে বিগড়াইয়া যাইবে ভাবিয়া টাকা পয়সা সম্পত্তিতে সমান অংশীদার ছোট ভাইটার সঙ্গে মা কি পরামর্শ করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে তার মন চায় না ?

জটিল আবর্তে পাক খাওয়া তার চেতনাকে শান্ত সংহত করিতে নলিনীও যেন চাবুক কষায় লাগাম আঁটিয়া দিতে চায়।

'জুতো ছিঁড়ে গেছে, একটা ভাল শাড়ী নেই, ব্লাউজ নেই। কী করে পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে চালাই বলতো? তোমারি তো নিন্দে হবে।'

যে প্রশ্ন তুলিতে পারিতেছিল না, যে প্রসঙ্গ আড়ালে ছিল, নলিনী ছেলেমানুষ অভিমানে সেই প্রশ্ন সেই প্রসঙ্গ সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

'মা কিনে দেয় না? নগেন কিনে দেয় না? কি নিয়ে এত গুজগাছ ফুস ফাস চলে তোদের ?'

'সে তো মা আর ছোড়দা ভাগ হবার কথা বলাবলি করে। আমি কিছু চাই নাকি ওদের কাছে? চাইলেই তো মুখ খিঁচিয়ে বলবে দাদার কাছে যা। আমারি হয়েছে মুস্কিল।'

বাড়ির সাধারণ বেশ নলিনীর। মিলের রঙীন ফাইন শাড়ীটার দাম কম নয়। জামাটি দেখিয়াই চেনা যায়--সন্ধ্যার। দেখাদেখি কিনিয়াছে। পায়ে রঙীন হাল্কা লপেটা। নলিনী আজকাল বাড়ীতেও লপেটা পায়ে দিয়া চলে!

মোহন অসহায় বোধ করে। অগত্যা উদারভাবে বলে, 'আজ যখন বেরোব, সঙ্গে যাস্, নিজে পছন্দ করে কিনে নিস্ যা দরকার। ওরা ভিন্ন হতে চাইছে, না?'

'চাইছে তো। মার সঙ্গে ছোড়দার বনছে না, নইলে কবে ভাগ হয়ে যেত। মা বলছে সব ভাগাভাগি করে দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হবে, ছোড়দা চাইছে কলকাতায় ভিন্ন থাকবে। দু'জনে বনছে না বলেই তো!'

নগেনের নীরব ও নিষ্ক্রিয় উপেক্ষাই সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক মনে হয়। তাকে কাছে টানিবার চেষ্টা মোহনের ব্যর্থ হয়, নিজে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করিয়া আহত হইয়া ফিরিয়া আসে। ভাইটির সঙ্গে বাজে গল্প করিবে ভাবে, গল্প জমে না, নগেন উসখুস করিতে থাকে। তর্ক করিবে ভাবে, নগেন তর্ক করে না। তাকে খুসী করার জন্য সাংসারিক ব্যাপারে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, নগেন শুধু বলে, আমি কিছু জানি না দাদা! তার নিজের ভালমন্দের আলোচনা তুলিলে সে স্পষ্টই বিরক্ত হয়, এ যেন মোহনের অনধিকার চর্চ্চা! চুপচাপ উপদেশ শোনে, মানে না।

একদিন ধৈর্য্য হারাইয়া সে তাকে শাসন করিতে গিয়াছিল—তখন উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় উঁচু করিয়া নগেন কি যেন ভয়ানক কথা বলিতে গিয়াছিল, কি ভাবিয়া ভাগ্যে বলে নাই!

এখনো তবু তাকে কাছে ডাকা যায়, কথা বলা যায় গল্প করা যায়। কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়া যাইত নগেন কথাগুলি বলিয়া ফেলিলে! তখন তার মনের অবস্থা এমন, মনে মনে অনুতাপ বোধ করিলেও মাথা নত করিয়া ছল ছল চোখে দাদার কাছে সে স্তব্ধ [illegible] দাঁড়াইতে পারিত না, গায়ে পড়িয়া সেও পারিত না তাকে ক্ষমা করিতে।

এমন হইয়া গেল কিসে?

শুধু মার কথা শুনিয়া শুনিয়াই তার মনে এত বিরাগ জমিয়াছে দাদার বিরুদ্ধে, এত বিদ্বেষ, এত হিংসা জাগিয়াছে? টাকা নষ্ট করিয়া সে ভাইবোনের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তার বিরুদ্ধে মার বক্তব্য শুধু এই। নগেন না হয় বিশ্বাস করিয়াছে তার স্বার্থপর দাদা তাদের ভাগের টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি নিজের সুখের জন্য

উড়াইয়া দিতেছে কিন্তু এমন তীব্র এবং স্থায়ী বিদ্বেষ জন্মানোর যথেষ্ট কারণ তো সেটা নয় ?

টাকা আর ভবিষ্যতকে এত বেশী দাম দেওয়ার বয়স তার হয় নাই। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে এমন ভীষণভাবে সচেতন হওয়ার কারণ বা প্রয়োজন তার কি থাকিতে পারে ?

যখন খুসী গাড়ী লইয়া নগেন বাহির হইয়া যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করে না।

মোহনের নিজের দরকার থাকে গাড়ীর, হঠাৎ জানিতে পারে নগেন গাড়ী লইয়া চলিয়া গিয়াছে, কখন ফিরিবে ঠিক নাই।

মোহন বিশেষ বিশেষ এনগেজমেণ্ট রাখিতে যায় ট্যাক্সি চাপিয়া। ট্যাক্সিও মোটর গাড়ী, তবু মোহনের মনে হয় নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়ার সমস্ত আনন্দ মাটি হইয়া গেল।

মোহন জিজ্ঞাসা করে না, মদন নিজেই তাকে খবর দেয়, ঝরণাকে সঙ্গে করিয়া নগেন গাড়ীতে হাওয়া খাইতে বাহির হয়। কোনদিন সহরের বাহিরে, কোনদিন সহরের ভিতরে। কোনদিন ধীরে ধীরে মদনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়ের মাঠের চারিদিকে পাক খাইতে হয়, কোনদিন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিতে হয় ঊর্দ্ধশ্বাসে।

নগেন সোল্লাসে বলে, 'জোরে চালাও মদন, আরও জোরে।'

ঝরণা ধমক দেয়, 'না, স্পিড কমাও। অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাবে নাকি ?'

মদনের কাছে সব কথা শুনিয়াও নগেনকে মোহন কিছু বলে না।

'কাল গাড়ী নিয়ে যেও না নগেন, আমার একটু দরকার আছে,'— এই অনুরোধ জানাইতে পর্য্যন্ত তার সাহস হয় না। মার শিক্ষায় হোক আর ঝরণার প্ররোচনায় হোক, তার বিনানুমতিতে নগেনের গাড়ী দখল করার মানেটা স্পষ্ট।

বাপের টাকায় গাড়ী কেনা হইয়াছে, গাড়ী ব্যবহার করার সমান অধিকার

নগেনের আছে বৈকি। যুক্তিসঙ্গত অধিকার, আইনসঙ্গত অধিকার, আত্মীয়স্বজনের সমর্থিত অধিকার।

নিজের ভীরুতাকে স্বীকার করিতে হওয়ায় এসব সহ্য করা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মোহন জানে এভাবে চলিতে পারে না, পারিবারিক জীবনে তার যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাকে আর ঠেকানো চলে না, একদিন এ জীবন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবেই এবং তার বেশী দেরী নাই!

তবু সে প্রাণপণে সংঘর্ষ এড়াইয়া চলে, শেষ বুঝাপড়ার দিনটা যতদিন পারে পিছাইয়া দিতে চায়, মিথ্যা আশায় নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

টাকা চাই, টাকা।

টাকা আনিতে পারিলেই আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। কোন রকমে যদি এই অশান্তি আর অপমানের জ্বালা সহ্য করিয়া সে আর কিছুদিন সংসারে এই শোচনীয় অবস্থাকেও বজায় রাখিয়া চলিতে পারে এবং সেই অবসরে উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলে, সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে।

পরিকল্পনা তো তার অনেক আগে হইতেই ঠিক করা আছে, এখন সেটা কাজে লাগাইয়া দিলেই হইল।

কিন্তু এসব চিন্তার ফাঁকি কোথায় মোহন জানে। একটা যে মৃদু আতঙ্ক সর্ব্বদা তার হৃদয়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, সেটাই তার প্রমাণ।

তার পরিকল্পনা, অলু চমৎকার, অবাস্তব স্বপ্নও সেগুলি নয়, কারণ বাছিয়া বাছিয়া রূঢ় বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভাব্য খুঁটিনাটি অনেক বাধাবিপত্তির চিন্তাকেও তার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তবু সেগুলি কাজে লাগিবে না। ওসব পরিকল্পনার প্রচুর নিরপেক্ষ সংস্কার প্রয়োজন, নিজের তার প্রয়োজন অনেক অভিজ্ঞতার অনেক সময়ের এবং অনেক মূলধনের।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, অনিবার্য্য প্রয়োজন, তার নিজের অন্য ধরণের মানুষ হওয়া।

মৃদু গর্ব্বের সঙ্গে মোহন এই আত্মস্বীকৃতিকে গ্রহণ করে। সে বোকা নয়। ব্যর্থতার সঙ্কেতকে সে চোখ বুজিয়া এড়াইয়া চলে না। মিথ্যা আশা যদি সে পোষণ করে, জানিয়া শুনিয়া করে, নিশ্চিত মরণের প্রতীক্ষারত রোগীর ঔষধ খাওয়ার মত।

নিজেকে সে ধিক্কার দেয় শুধু ভীরুতার জন্য। কেন সে চুপ করিয়া থাকে? কেন সে মাকে জোর করিয়া দেশে পাঠাইয়া দেয় না, শাসন করে না ভাইবোনকে? উপেক্ষা আর অবাধ্যতা সহ্য করার বদলে গর্জ্জন করিয়া ওঠে না?

তার সাহস নাই। সহরের জীবন-স্রোতে সে কুটার মত ভাসিয়া চলিয়াছে, নোঙরের ব্যবস্থা করিতে স্মরণ ছিল না।